“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার”

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস

২৮ এপ্রিল ২০২১

বিশেষ স্মরণিকা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার”

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস
২৮ এপ্রিল ২০২১

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands
UKaid from the British people

“এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়.....
এই স্বাধীনতা তখনি আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।”

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

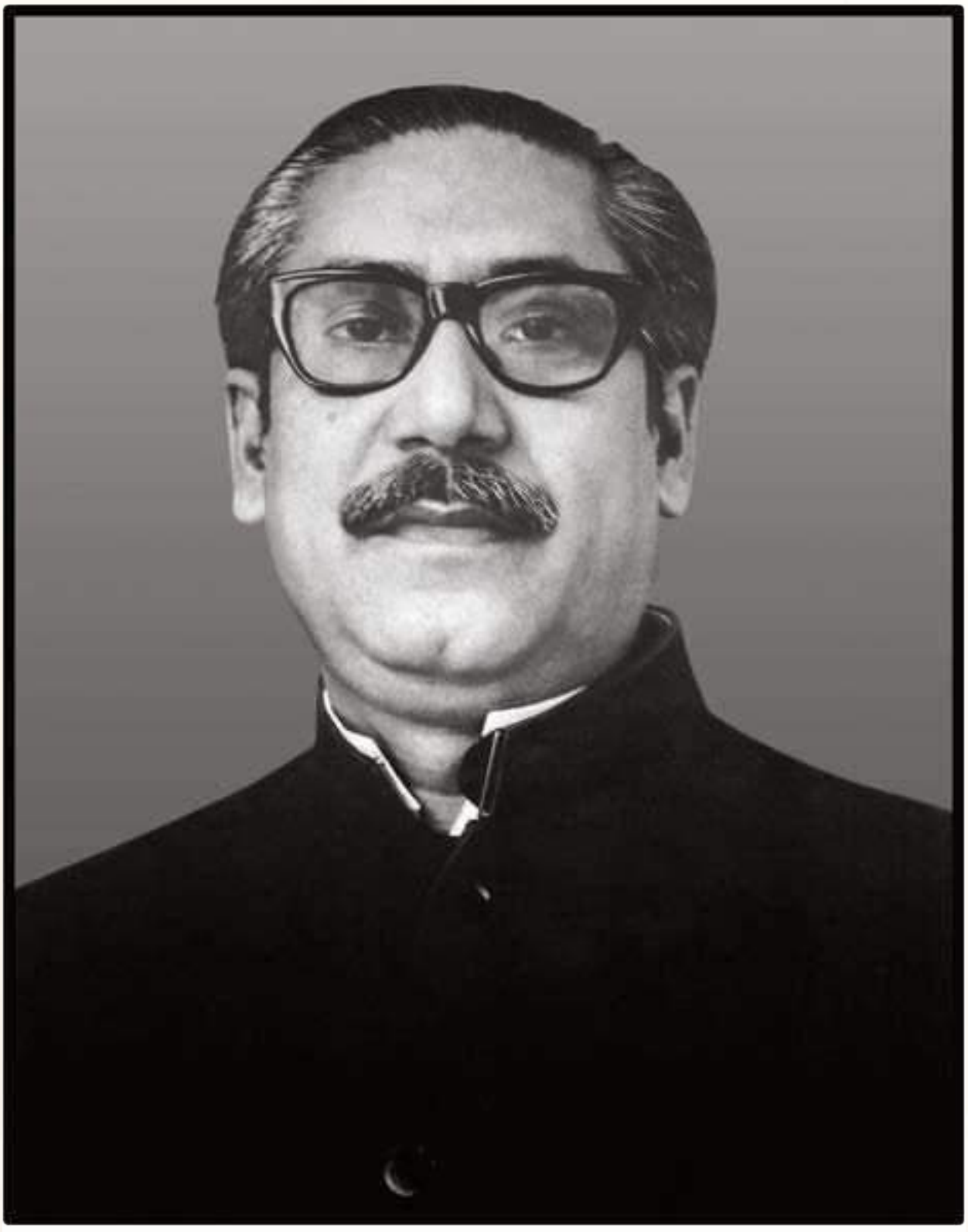

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৫ বৈশাখ ১৪২৮
২৮ এপ্রিল ২০২১

বাণী

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার' অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল কলকারখানা জাতীয়করণ করেন। জাতির পিতার সময়োচিত ও যথাযথ সিদ্ধান্তের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কলকারখানাগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুরক্ষা ও আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করেই সরকার দেশের সকল খাতের শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। এই অর্জনে এদেশের শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস এমন একটি মুহূর্তে পালিত হচ্ছে, যখন করোনা ভাইরাস সংক্রমণে সৃষ্ট মহামারির ফলে সারাবিশ্বে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারীসহ সকল নাগরিকের সার্বিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে। দেশে শিল্প-কারখানা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈরি হয়েছে অসংখ্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। রপ্তানি বাণিজ্যের বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি আরও বিস্তৃত করার নিমিত্তে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করাসহ উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ ও সকল অংশীজনের সম্মিলিত উদ্যোগের বাস্তবায়ন আবশ্যক বলে আমি মনে করি। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষা প্রতিটি শ্রমিকের আইনগত অধিকার। বিষয়টিকে কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে জাতীয় সংস্কৃতি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। আমি কর্মস্থলে নিরাপদ পরিবেশ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিক, মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১' উদযাপন সফল হোক – এ কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ বৈশাখ ১৪২৮
২৮ এপ্রিল ২০২১

বাণী

প্রতিবারের ন্যায় এবছরও 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার'- সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু, শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিসহ তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন ও হালনাগাদ করেছি। আওয়ামীলীগ সরকার 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩' ও 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫' প্রণয়ন করেছে। আমাদের উদ্যোগে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমরা শ্রমিকদের চিকিৎসায়, তাঁদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পরিবারকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছি। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উৎপাদন অব্যাহত রেখেছি। এছাড়া 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবসৃষ্ট সংকট কাটিয়ে উঠতে আমরা শিল্প, কৃষিসহ মোট ২০টি খাতের অনুকূলে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। আমাদের এসব উদ্যোগের ফলে কর্মপরিবেশসহ শ্রমিকদের জীবনমানের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটছে।

আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার যে লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সে লক্ষ্য অর্জনে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার কোন বিকল্প নেই। সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করে যাব, ইনশাআল্লাহ।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার"- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের ন্যায় এবারেও ২৮ এপ্রিল,২০২১ তারিখ "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করছে।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঘোষিত "মুজিববর্ষে" উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ ঘোষণার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ একটি প্রত্যয়ী ও মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এবং সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। একই সাথে তিনি রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় আমরা সকলে মিলে করোনা মহামারি দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করছি। শিল্প কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরুপন নিরসন, শ্রমিকের জীবনমান বৃদ্ধি, শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শ্রম আইন-২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা-২০১৫ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিষ্ঠারসাথে কাজ করে যাচ্ছে। এ বছর কাঁচ, রেশম, সিরামিক, জাহাজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য সেক্টরগুলো শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় এর অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর থেকে প্রণীত কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে "পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা" কারখানা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনাকালীন বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এ অধিদপ্তরের চিকিৎসকগণের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বর্তমান শ্রমবান্ধব সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় স্বমহিমায় উজ্জ্বল অবস্থানে বাংলাদেশ। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ আমাদের অগ্রাধিকার। মুজিববর্ষে আয়োজিত "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১" উপলক্ষ্যে স্বরণিকা প্রকাশ কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক এ দেশের মেহনতি মানুষের।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

সভাপতি
বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স
এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
(বিকেএমইএ)

বাণী

করোনা সংক্রমনের প্রাথমিক পর্যায়ে ২০২০ সালে জাতিসংঘ আশঙ্কা করেছিলো করোনা (কোভিড-১৯)'র কারণে বিশ্ব অর্থনীতি ২.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির পরিবর্তে ১ শতাংশ পর্যন্ত সংকুচিত হতে পারে। বছর শেষে বাস্তবিক পর্যালোচনায় সেটি আসলে ৪.৩ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে এই মহামারীর সংকট বিবেচনা করে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাস উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে দূর্বল প্রবৃদ্ধি এবং আর্থিক সমস্যার কারণে ঋণ সংকট সৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এ সমস্যা নিরসনে উন্নত দেশগুলোর জোট জি-২০ কর্তৃক দরিদ্র দেশগুলোর কাছ থেকে এক বছর ঋণ আদায় স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কোভিড-১৯ এর কড়াল থাবায় যখন সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতি দোদুল্যমান, আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পখাতও তখন তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রতি নিয়ত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নানাবিধ চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের পরে এরকম সংকটের মুখোমুখি আমাদেরকে আগে কখনো হতে হয়নি। দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠানো ধরে রাখতে কারখানা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি শ্রমিক ভাইবোনদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন আমাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের শুরুর দিকে আমরা পোশাক শিল্পকারখানাগুলো চালু রাখা নিয়ে অনেক আতঙ্কিত ছিলাম। এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সিংহভাগই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলো থেকে আগত এবং স্বল্পশিক্ষিত। সঠিক স্বাস্থবিধি অনুসরন, সুষম খাদ্যাভাস, শুদ্ধ জীবনাচার, খাদ্যের পুষ্টিগুনাগুণ সম্পর্কে তারা অনেকটাই অসচেতন। দীর্ঘ একটি বিরতির পরে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত সকল স্বাস্থবিধি অনুসরন করে কারখানা কার্যক্রম পুনরায় চালু করা। আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই তার সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সরকারি প্রণোদনার মাধ্যমে শিল্পখাতকে টিকিয়ে রাখতে সকল সহযোগীতার জন্য।

করোনার প্রথম ঢেউকে আমরা সফলতার সাথেই মোকাবেলা করতে পেরেছি। যুক্তরাষ্ট্রে ব্লমবার্গ প্রণীত কোভিড-১৯ সহনশীল র‍্যাংকিং বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ এবং বিশ্বে ২০ তম স্থান অর্জন করেছে। নিউ নরমাল বাস্তবতায় আমরা সকলেই বুঝতে পারছি, স্বাস্থ্যখাতে আমাদের শতভাগ মনোযোগ এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাসের মাধ্যমে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় আতঙ্কিত না হয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদেরকে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে হবে। করোনা মোকাবেলায় মালিক শ্রমিক সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সচেতনতার মাধ্যমে সংক্রমন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বিকেএমইএ প্রতিনিয়তই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নীট শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। নিয়মিত বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম, এবং প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। সুস্থ, দক্ষ শ্রমিক শিল্পখাতের প্রাণ। করোনা পরবর্তী নতুন পৃথিবীতে অটোমেশন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর অনাগত প্রযুক্তিযুগের মূল নিয়ন্ত্রক হবে দক্ষ, পরিশ্রমী, এবং নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম কর্মীরা।

এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার"-প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালিত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) মোকাবেলায় সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে এ বছর দিবসটি পালিত হবে। সকল কর্মক্ষেত্রে কাজের শোভন পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও কোভিড-১৯ নামক নজিরবিহীন মহামারীতে আক্রান্ত। এই ভাইরাসের কারণে মানুষকে জীবন-যাপনে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য করোনা সংক্রমণের শুরুতেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশনার ২৯ দফায় "শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন" মর্মে উল্লেখ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়টি পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষানীতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে। শ্রমঘন বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা বর্তমান পরিস্থিতিতে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তবে আশাব্যঞ্জক বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় যথেষ্ট তৎপর। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রত্যেকটি দপ্তর হতে নেওয়া হয়েছে নানাবিধ কার্যক্রম। বিশেষ করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর হতে চালু করা হয়েছে টেলিমেডিসিন সেবা, সার্বক্ষণিক হেল্প লাইন (১৬৩৫৭) সেবা, বিশেষ পরিদর্শন, শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মাঝে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কার্যক্রম পরিচালনাসহ আরও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করে শ্রম বান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানায় গঠন করা হয়েছে 'সেইফটি কমিটি'। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আওতাধীন Remediation Coordination Cell (RCC)-এর মাধ্যমে দেশের ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানায় সংস্কার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদনের জন্য রাজশাহীর তেরখাদিয়ায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI)-এর নির্মাণ কাজ চলছে। কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে সচেষ্ট হতে হবে। মালিকপক্ষকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে এবারের জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে 'বঙ্গবন্ধু গ্রীণ ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' নামে এই পুরস্কার প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আমি জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২১ উদযাপনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরসহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। দিবসটি পালনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)সহ উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের কারিগরি সহায়তার জন্য তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কে, এম আব্দুস সালাম

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ অনুসারে ২৮ এপ্রিল ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" পালন করা হচ্ছে। এবারে এ দিবসটি পালনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার"। মুজিববর্ষে শ্রমিকের জন্য উন্নত ও ঝুঁকিহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এ দিবস পালনের মূল লক্ষ্য।

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। সারা বিশ্বের সাথে সাথে সমগ্র বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর বিস্তার ঘটেছে। ফলে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করার বিষয়টি পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার সাথে উৎপাদনশীলতা অনেকাংশে জড়িত। এজন্য বর্তমান সরকার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণের বিষয়টি সার্বক্ষণিক লক্ষ্য রাখছে। সে লক্ষ্যে কারখানাগুলোতে বিশেষ পরিদর্শন, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সচেতনতামূলক পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বিত কার্যক্রম চলমান রেখেছে। এছাড়াও করোনাকালীন সময়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সারাদেশের বিভিন্ন শিল্প কলকারখানায় উদ্ভূত অগণিত শ্রম অসন্তোষ নিরসনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শ্রমিক, মালিক ও সরকার এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ দুর্যোগ মোকাবেলা করা যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কর্মস্থলের নিরাপত্তার উপর একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে জড়িত। এ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে ৩৭৮০টি তৈরি পোশাক কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার প্রাথমিক মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ও সংস্কার কাজের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং কেমিক্যাল ও প্লাস্টিক কারখানায় অনুরূপ নিরাপত্তার প্রাথমিক মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে পোশাক শিল্প, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও চামড়া শিল্প থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। ১৩টি জেলায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রকল্প চলমান রয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালার আলোকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্য শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি মালিকের জন্য শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ বিনিয়োগ। সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প কারখানাগুলোতে জীবন ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে এবং শিল্পায়ন দ্রুত এগিয়ে যাবে-এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও মালিকের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে সকল পক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবস পালনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহান দিবসে আমি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিক, মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তির জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার পরপরই তিনি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, কলকারখানাকে জাতীয়করণ করে শ্রমিকদের কল্যাণ ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য পদ লাভ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ আই.এল.ও. কনভেনশনসমূহকে মর্যাদার সাথে গ্রহণ করা হয়। একই বছরে শ্রমিক সমাজের মুক্তির দলিল হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে ১ম জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটি বা নিরাপত্তা একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত সবার স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও কল্যাণের বিষয়। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কলকারখানায় শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির বিকল্প নেই। কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার মতো বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শ্রমিক-মালিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিই এ দিবস উদ্‌যাপনের সফলতা বলে মনে করি।

বর্তমান সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নের এ অভিযাত্রায় সরকারের কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রমিক-মালিক সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১' উপলক্ষে গৃহী সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

আবদুল লতিফ খান এনডিসি

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১" উদযাপন উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশিত হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দেশে দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং ক্রমবর্ধমানহারে বহুতল/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে অগ্নি-দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ নতুন মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা আমাদের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছি। এ স্বপ্ন পূরণ করতে হলে সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ কর্মজীবী সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করা একটি অন্যতম শর্ত। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে শিল্প কারখানায় কর্মরত সকলের নিরাপত্তা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা বজায় রাখা আমাদের সকলের একান্ত দায়িত্ব। দেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করাসহ নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে সকল মহলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন মালিক ও ব্যবহারকারী সকলকে নিরাপত্তা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। শুধু সরকারি উদ্যোগে সকলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা রক্ষা করার পাশাপাশি পেশাগতকাজে নিয়োজিতদের জন্য শতভাগ নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাটা দুরূহ। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এ বিষয়ে আন্তরিক ও যত্নবান হতে হবে। আমি মনে করি, এই লক্ষ্য পূরণে দেশব্যাপী বিপুল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১" উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পোশাক শিল্প খাতসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোগে বছরব্যাপী পরিদর্শন, গণসংযোগ, মহড়া, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১" উদযাপনের সকল কার্যক্রম একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

আমি "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১"-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন। বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

International Labour Organization

Country Director
ILO Country Office for Bangladesh

Message

Our world of work is being profoundly affected by the COVID-19 pandemic which has caused economic and social disruptions and threatened public health.

The second wave of the pandemic is sweeping across Bangladesh as we mark World Day for Safety and Health at Work 2021.

The long-term livelihoods and wellbeing of millions are at stake. And yet, many hundreds of thousands of workers continue to work hard to keep the society and the economy functioning.

The Occupational Safety and Health of all workers in all industries must be a national priority. At the outbreak of the pandemic, the ILO together with the Department of Inspection for Factories and Establishments, employers, trade union and other stakeholders developed a national Occupational Safety and Health (OSH) guideline which was published by the Ministry of Labour in Bangladesh in October 2020.

This COVID-19 specific OSH guideline includes recommendations and tools to help government, employers, workers and relevant stakeholders plan and organize the containment of the virus in workplaces. The ILO's virtual Learning Hub has trained master trainers from the garment industry on COVID-19 specific OSH measures who then engaged with factory management and safety committees to disseminate the messages in the national guideline.

The safety of workers and business sustainability can both be secured if the measures recommended in the guideline are implemented by all industries.

This year, the World Day for Safety and Health at Work focuses on strengthening of the national OSH systems to build resilience so that current and future crises can be managed better.

COVID-19 has demonstrated the significance of OSH in creating safe working environments and its impact on with public health. This is an opportunity for us to raise awareness and stimulate dialogue on the importance of creating and investing in resilient OSH systems. The OSH Management System in Bangladesh can be strengthened at the national level and industry level through the engagement of government, employers, trade unions and stakeholders.

Looking ahead, we see tentative signs of recovery from the pandemic this year. With the right policies and actions, a human-centred recovery can be achieved that would safeguard employment, incomes, workers' rights and welfare. On this World Day for Safety and Health at Work, let us make a pledge to build back better and put OSH resilience at the heart of our recovery plan and response.

Tuomo Poutiainen

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

H.E. Benoit Préfontaine
High Commissioner of Canada

H.E. Harry-Verweij
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands

H.E. Robert Chatterton Dickson
High Commissioner of the United Kingdom

Joint Statement by Development Partners

It has been over a year since COVID-19 shook the world and it is clear that the pandemic isn't over yet. This global outbreak has a profound effect on the way we organize and work together, and it is encouraging to see the World Day for Safety and Health being attended in Bangladesh. This year, the theme of the day is 'Anticipate, prepare and respond to crises - Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health (OSH) Systems'.

As development partners of Bangladesh, we appreciate the measures taken by the Government of Bangladesh to ensure that its citizens work in safe and healthy environments, free from harassment and violence. We commend the Government of Bangladesh for extending its additional support to factory workers during the past year. We expect that these measures not only support workers today, but that they will contribute to improve working conditions in Bangladesh beyond the pandemic.

As major buyers of ready-made garment (RMG) products from Bangladesh, we are attentive and accountable to the expectations of our consumers regarding fair and ethical sourcing. We, as international donors have been committed to making the RMG industry of Bangladesh safer through an International Labour Organization (ILO) programme implemented in collaboration with the Government of Bangladesh, as well as employers' and workers' organizations. The programme has made a positive contribution to enhance workplace safety in the RMG sector and also supported the establishment of a modern labour inspection system that benefits all industries covered by Bangladesh labour law. Additionally, the strengthening of the Department of Inspections for Factories and Establishments (DIFE) has enabled it to offer more effective inspection services.

The sector looks very different today. We take pride in seeing the label 'Made in Bangladesh' in the wardrobes of our citizens. There is no time for complacency however, much remains to be done. We would like to see a more effective coordination with other government agencies to help identify factories at risk. This will help to immediately take action and save the lives of workers in those factories.

Bangladesh should not have to do this alone. We stand with Bangladesh as trusted partners in its journey towards socio-economic prosperity. But it is not only up to us and Bangladesh. We ask the attention of the brands and buyers sourcing from Bangladesh and urge them to be supportive of these ongoing endeavours, to ensure the safety and well-being of over four million RMG workers and their families in Bangladesh. The continued support of the brands and buyers is the only way the RMG sector can come back strongly after the pandemic ends.

We wish all Bangladeshis a happy National Occupational Safety and Health Day!

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২৮ এপ্রিল দেশে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এবারের দিবসটি অন্যান্য বারের চেয়ে একটু আলাদা, কেননা বর্তমানে করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীর কারণে বিশ্বের সবকিছুই স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশ্বের সব দেশের মতো আমাদের দেশেও এই ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ আঘাত হানছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যার কারণে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি আরো জোরালোভাবে আমাদের সামনে এসেছে। কোভিড-১৯ এর কারণে সমগ্র বিশ্বের মানুষ ও অর্থনীতি এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই মহামারীর সময় শ্রমিকদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং তা অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

করোনা মহামারী সফলভাবে সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সরকারের এই কাজকে সফলতা দিতে মালিকপক্ষ প্রথমে তাদের সকল শ্রমিক-কর্মচারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ও করবে এবং পরবর্তীতে উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রাখবে যাতে করে অর্থনীতির চাকা প্রয়োজনীয় গতিতে চলতে পারে। দেশের অর্থনীতিকে স্বাভাবিক রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্ভাব্য সকল ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছেন। এই জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাংলাদেশের শিল্পখাতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও আমাদের মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির বছরে পালিত হতে যাওয়া এবারের দিবসটি অধিক তাৎপর্যমণ্ডিত। এমন দুটি উৎসবের মধ্যেও মহামারীর বিষয়টি আমাদের ভাবিয়ে তুলছে। মহামারীর এই সংকট মোকাবেলায় শিল্প-কারখানার উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে যেমন শ্রমিকদের দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি মালিকদের খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। কেননা শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য উৎপাদনের গতিকে স্বাভাবিক রাখার নিশ্চয়তা দিতে পারে। সুতরাং আমি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন-এর পক্ষ থেকে সকলকে আহ্বান জানাতে চাই, আসুন আমরা সকলেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করি।

পরিশেষে, আমি দিবসটি উপলক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

কামরান টি. রহমান

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

সভাপতি
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক
ও রপ্তানীকারক সমিতি
(বিজিএমইএ)

বাণী

প্রতি বছর ২৮ এপ্রিল তারিখে আন্তর্জাতিকভাবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস পালন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হচ্ছে জেনে বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিজিএমইএ বিশ্বাস করে যে, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র কর্মীর অন্যতম মৌলিক অধিকার। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি শোভন কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কর্মীদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন রকমের বিপদ এবং ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখার বিষয়ে বিজিএমইএ সর্বদা কাজ করছে। সুস্থ্য-সবল কর্মী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। সম্প্রতি কোভিড-১৯ এর অতিমারির কারণে কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিজিএমইএ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কোভিড গাইডলাইন প্রতিপালনের জন্য প্রতিটি কারখানাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি তা প্রতিপালন হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্য বিজিএমইএ মনিটরিং টীম প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মীদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আইএলও, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ যৌথভাবে কারখানসমূহে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১০০ জন প্রশিক্ষিত মাস্টার ট্রেনারের মাধ্যমে ৫৮৪টি তৈরি পোশাক কারখানায় ৮ (আট) লক্ষ কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ ছাড়াও কারখানা পর্যায়ে সেইফটি কমিটি চালু এবং কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কমিটিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি কোভিড-১৯ অতিমারির সময়কালে আইএলও-এর সহযোগীতায় মোট ৫১০টি কারখানায় ২০৪০ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪০ জন প্রশিক্ষিত মাস্টার ট্রেনারের মাধ্যমে ২৫৫টি কারখানায় ৯৬০ জন কর্মীকে কোভিড-১৯ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সংক্রামক রোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কমর্স্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মীর সুস্বাস্থ্য ও কর্মস্থলের নিরাপত্তা উৎপাদনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। সার্বিক বিবেচনায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে শিল্প এগিয়ে যাবে, এটাই কাম্য।

পরিশেষে, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফারুক হাসান

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত)
জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

২৮ এপ্রিল "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস- ২০২১" উদযাপন উপলক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের উদ্যোগে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা শ্রমজীবীদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের। "বিশ্ব পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" ২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) উদযাপন করে আসছে। "শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা শ্রমিকদের অধিকার" হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শ্রমিকবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রাধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।

শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। বাংলাদেশের শ্রম নির্ভর অর্থনীতিতে শ্রমিক বাঁচলে শিল্প বাঁচবে, শিল্প বাঁচলে দেশ বাঁচবে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগ আপোষহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মহান স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জন এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের শ্রমিক সমাজের অবদান অপরিসীম।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধ্বসে সেখানকার পাঁচটি পোশাক কারখানার প্রায় ১১৩৭ জন শ্রমিক নিহত হন, যার ফলে পেশাগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জননেত্রী শেখ হাসিনা'র সরকার সহ আন্তর্জাতিক মহল শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার হয়।গণতন্ত্রের মানসকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে গঠিত সরকার শ্রমিকদের প্রত্যাশার প্রতি লক্ষ্য রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে প্রাধান্য দিয়ে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকার জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করেছে। রাজশাহীতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের শ্রমবান্ধব নীতিমালা ও কার্যক্রম দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

দেশকে এগিয়ে নিতে, দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নে আপোষহীন থেকে সরকার-মালিক-শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে গঠনমূলক, দায়িত্বশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে শ্রমিকের চাওয়া হবে- "শোভন কাজ, নিরাপদ জীবন, নিশ্চিত করব টেকসই উন্নয়ন"।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু- জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

নূর কুতুব আলম মান্নান

২৮ এপ্রিল

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২১

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

সম্পাদকীয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে পঞ্চমবারের মতো 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফ্‌টি দিবস-২০২১' পালিত হচ্ছে। এই বছর দিবস (২৮ এপ্রিল)টির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার'। জাতীয় জীবনে বিশেষত কোভিড-১৯ অতিমারী চলাকালীন এই সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রতিপাদ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী। বাংলাদেশ সরকারও এ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসহ নানা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন তথা বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে উন্নীত করার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে সুস্থ ও দক্ষ শ্রমশক্তি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও সরকার-মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক। শ্রমঘন অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এবং এর গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন ও সুষ্ঠু তদারকের মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা বিধানের কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফ্‌টি দিবস-২০২১ উদ্‌যাপন সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অপরিসীম ভূমিকা রাখবে বলে অশাবাদ ব্যক্ত করছি।

প্রণিধানযোগ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল নেতৃত্বে বিশ্ব বিপর্যয়কারী করোনা (কোভিড-১৯) অতিমারি পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ (সরকারি দপ্তর, মালিকপক্ষ, শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন) কে একত্রিত করে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার প্রচেষ্টা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আলোচ্য স্মরণিকা প্রকাশও এ প্রচেষ্টার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র যা মেহনতী মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে আলোচ্য স্মরণিকা প্রস্তুতিতে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং যারা লেখা দিয়ে স্মরণিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মুদ্রণজনিত ও অন্যান্য ভুলের জন্য মার্জন চেয়ে নিচ্ছি। আমি 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফ্‌টি দিবস'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. সেলিনা আক্তার
অতিরিক্ত সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক
স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:
কে, এম আব্দুস সালাম
সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিশেষ সহযোগিতায়:
মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

কারিগরি সহযোগিতায়:
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)

সম্পাদক:
ড. সেলিনা আক্তার
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি:
শরীফ মো: ফরহাদ হোসেন, উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সুকান্ত বসাক, সিস্টেম এনালিস্ট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাকেরা আহমেদ, সিনিয়র সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সুহানা ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মো: আব্দুল কাদের, সিনিয়র সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বেগম মোরশেদা হাই, সহকারী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সাবিহা মুক্তা, উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মো: আবু হাসানাত, উপ পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
মো: ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
ডা: নাজমুন নাহার, সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সৈয়দা মুনিরা সুলতানা, প্রোগ্রাম অফিসার, আইএলও
মো: রাশেদুল আলম, শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মো: ওহীদুর রহমান, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মো: আব্দুল মজিদ, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
ফারহানা কবির, শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
প্রতিষ্ঠা বড়ুয়া, শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
মেহেদী হাসান, প্রজেক্ট সাপোর্ট অফিসার, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

প্রকাশনা:
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল:
২৮ এপ্রিল, ২০২১

ডিজাইন ও প্রিন্ট:
প্রগ্রেসিভ প্রিন্টার্স প্রা: লি:

সূচিপত্র

০১	করোনা প্রতিরোধে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিকেএমইএ'র ভূমিকা এ.কে.এম. সেলিম ওসমান	৩৭
০২	"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার" মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ	৪১
০৩	অগ্রযাত্রায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স মো: সাজ্জাদ হোসাইন	৪৫
০৪	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ডাঃ মোঃ শফিউর রহমান	৪৮
০৫	How long can we afford to neglect the workplace risk management? Abu Nayeem Md Shahidullah	৫২
০৬	প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন, ব্যবহার, বর্জ্যব্যবস্থাপনা এবং শিল্প কারখানার পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যঝুঁকিঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও আমাদের করণীয় ড. মোঃ ইয়াছির আরাফাত খান	৫৬
০৭	Ensuring Occupational Safety and Health (OSH) in Bangladesh's RMG sector in the time of COVID-19 Anne-Laure Henry-Greard	৬২
০৮	Embassy of Denmark: contribution to improvement of OSH in Bangladesh Søren Asbjørn Albertsen	৬৪
০৯	Health and Safety in Workplace Mohammad Abbas Uddin (Shiyak)	৬৬

১০ নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রত্যেক শ্রমিকের আইনগত অধিকার ৭২
আলমগীর শামসুল আলামিন

১১ Importance of comprehensive Occupational Health and Safety Management System in Ready-Made Garments Sector in Bangladesh ৭৪
Mohammad Firoz Alam

১২ করোনাকালীন সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব ৭৮
মামুন অর রশিদ

১৩ করোনা পরিস্থিতি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ৮১
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

১৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি চিত্র ও করণীয় ৮৬
এ আর চৌধুরী রিপন

১৫ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মক্ষেত্রে যুবা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনের এখনই সময় ৯০
নইমুল আহসান জুয়েল

১৬ Social Security programmes for the working population: A need for the changing times ৯২
Syed Moazzem Hussain

১৭ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র ৯৭

করোনা প্রতিরোধে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিকেএমইএ'র ভূমিকা

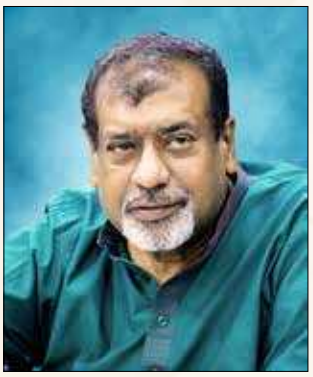

এ.কে.এম. সেলিম ওসমান, এমপি
সভাপতি
বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

২৬ মার্চ, ২০২১ আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূবর্ন জয়ন্তী উৎসব পালন করলাম। পঞ্চাশ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রায় অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক নেতিবাচকতা, অনেক সংশয় পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উন্নয়নের আলোচনায় মর্যাদার আসনে এখন বাংলাদেশ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ, দারিদ্র্য পরিস্থিতি, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ নানা কারণে এক সময় অনেকেই বাংলাদেশকে "বাস্কেট কেস" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। অথচ সময়ের পথপরিক্রমায় তাদের সকল আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত করে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন দক্ষিণ এশিয়ার "তেজি ষাড়"। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক হলিস বি. শেনারী ১৯৭৩ সালে বলেছিলেন, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলারে উন্নীত হতে আমাদেরকে ১২৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২০০০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। কাঠামোগত উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, গড় আয়ু বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের সমতা, শিশু মৃত্যুর হার, শিক্ষার হার, নারীর ক্ষমতায়নসহ অনেক সূচকেই বাংলাদেশ উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। আধুনিক বাংলাদেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ মূলতঃ তৈরি পোশাক শিল্পায়নের উত্তরণের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান তৈরি পোশাক রপ্তানীকারক দেশ। পোশাক শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে রপ্তানীখাত এগিয়ে গেছে দ্রুত গতিতে। আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা অক্ষুন্ন রেখে বৈশ্বিক পোশাক শিল্প খাতে শীর্ষস্থান অর্জনের লড়াইয়ে আমরা অনেকবার হোঁচট খেয়েছি। এতদসত্ত্বেও কারখানাতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র তৈরি, পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা, উন্নত শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, নারী শ্রমিকের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে আমরা কখনো আপোষ করিনি।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের ফলে বৈশ্বিক যে অর্থনৈতিক মহামারীর সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প খাত তার অন্যতম প্রধান শিকার। তৈরি পোশাক

শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে প্রতিনিয়ত আমাদেরকে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। করোনাকালীন সময়ে এই সংকট আরও প্রকট হয়ে ওঠে। বৈশ্বিক এই সংকটে এই শিল্প যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা সম্ভবত এর আগে কখনো ঘটেনি। পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সরকারের নির্দেশ অনুসারে আমরা দীর্ঘ দেড় মাস কারখানা বন্ধ রাখি। কাঁচামালের স্বল্পতা, বায়ারের ক্রয়াদেশ বাতিল, সংক্রমনের ঊর্ধ্বগতি সব মিলিয়ে এই শিল্পকে একটি বিরাট ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়। আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, তাঁর সময়োপোযোগী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে সঠিক সময়ে প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে তার সহোযোগিতার হাত সম্প্রসারণের জন্য। দীর্ঘ বিরতির পরে পরিস্থিতি একটু সহনীয় পর্যায়ে এলে, আন্তর্জাতিক পোশাক শিল্পের বাজারে একটু স্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হলে আমরা আবার কারখানা গুলোতে নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কার্যক্রম শুরু করি।

করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণঃ

নীট শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকেএমইএ কারখানার শ্রমিক ও তাদের জীবনমান উন্নয়নে সর্বদা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কারখানাতে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা ও নিরাপত্তা প্রদান করতে বিকেএমইএ তার উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। করোনা মোকাবেলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ছিলো নিয়মিত মাস্ক পরিধান, হাত ধোয়া, এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা। কারখানাগুলোতে কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই বিকেএমইএ'র মাধ্যমে প্রতিটি কারখানাতেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের কঠোর নির্দেশনা জারি করা হয় ।

প্রতিটি কারখানাতে প্রবেশপথে থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে শ্রমিকদের তাপমাত্রা পরিমাপ, কারখনার প্রবেশদ্বারেই হাত ধোয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কাজের মাঝেও নিয়মিত হাত ধোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা হয়। এছাড়াও কোন শ্রমিকের করোনা উপসর্গ দেখা দিলে কারখানার মাধ্যমে তার টেষ্টের ব্যবস্থা, আইসোলেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

করোনাকালীন পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে করণীয় সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিকেএমইএ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সহযোগীতায় কারখানাতে কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। কর্মক্ষেত্র জীবাণুমুক্তকরণ, আইসোলেশনে করণীয়, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের গুরুত্ব, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে করণীয় সম্পর্কে শ্রমিকদেরকে সচেতন করে তুলতে এই প্রশিক্ষণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই প্রশিক্ষণের আওতায় বিকেএমইএ অদ্যাবধি ১১৮৩ জন শ্রমিক এবং মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

চিত্র কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ

নিউট্রিশন অব ওয়ার্কিং উইমেন প্রকল্পঃ

করোনা পরিস্থিতির আগেই বিকেএমইএ পোশাকশিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর সহযোগীতায় নিউট্রিশন অব ওয়ার্কিং উইমেন প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত কারখানাতে কর্মরত শ্রমিকদের পুষ্টিমান সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এবং রক্তস্বল্পতা, কম ওজন, পুষ্টিহীনতা, শারীরিক দুর্বলতা নিরসনে আয়রণ-ফলিক সাপ্লিমেন্ট প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকেরা সহজ ও সুলভ সুষম খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি, শুদ্ধ জীবনাচার, রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে জানতে পারে। উদ্ভুত করোনা পরিস্থিতিতে এই প্রশিক্ষণ পুরোপুরি বাস্তবসম্মত ও জীবনমুখী হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র কারখানাতে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট প্রদান

নিউট্রিশন অব ওয়ার্কিং উইমেন প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত বিকেএমইএ সদস্যভূক্ত ১৫৩টি কারখানার এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শ্রমিককে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গর্ভবতী ও অগর্ভবতী নারীদেরকে বিনামূল্যে সাতাত্তর লক্ষ আয়রণ ফলিক এসিড ট্যাবলেট প্রদান করা হয়।নীট শিল্পে কর্মরত স্বল্প শিক্ষিত নারী শ্রমিকদের পুষ্টিমান উন্নয়নে, রক্তস্বল্পতা দূরীকরণে, সর্বোপরি জীবনমান উন্নয়নে নিউট্রিশন অব ওয়ার্কিং উইমেন প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পিরিয়ড কালীন হাইজিন বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচিঃ

নীট শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী। প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান তাদের খুবই সীমিত এবং বিভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পিরিয়ডকালীন সময়ে হাইজিন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও তাদের ধারণা সামান্য। প্রচলিত বিভিন্ন অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণের ফলে তারা প্রজনন স্বাস্থ্য জনিত নানা ধরনের জটিল রোগে ভোগে। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা তাদের গর্ভধারনের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। বিকেএমইএ এসকল নারী শ্রমিকদের সুরক্ষায় এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর সহয়োগীতায় পাইলটিং ভিত্তিতে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১০টি নীট শিল্প কারখানাতে কর্মশালা আয়োজন করে। এ কর্মশালার মাধ্যমে কারখানার নারী শ্রমিকদের বিনামূল্যে স্যানিটারী ন্যাপকিন বিতরণ, ডাক্তারের পরামর্শ প্রদান ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বমোট ১৮,৫০০ জন নারী শ্রমিককে এ সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও তারা পরবর্তীতে কারখানার মাধ্যমে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের উৎপাদিত স্যানিটারী ন্যাপকিন "জয়া" উৎপাদনমূল্যে ক্রয় করতে পারবে। বিকেএমইএ বিশ্বাস করে স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় এ উপকরণগুলি সরবরাহ করা সম্ভব হলে নারী শ্রমিকেরা স্যানিটারী ন্যাপকিন ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, যা তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যকর হবে।

চিত্র কারখানাতে পিরিয়ড সচেতনতা কর্মসূচি

এই মুহূর্তে বিশ্ব শতাব্দীর সবচেয়ে কঠিন দূর্যোগের মোকাবেলা করছে। নিউ নরমালের জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে উঠতে আমরা আবার করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সম্মুখীন। পরিস্থিতির সার্বিক বিবেচনায়, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরন করেই আমাদেরকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে। নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক পরার পাশাপাশি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সচেতন হতে হবে। বিকেএমইএ নীট শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে নীতিগত দায়বদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। বিকেএমইএ নিয়মিত তার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মালিকপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বিনিয়োগ, যার ফলে শ্রমিকদের কাজে অনুপুস্থিতির হার কমে, মাইগ্রেশন কমে, দূর্ঘটনার ঝূঁকি কমে, উৎপাদনশীলতা বাড়ে, ক্রেতার আস্থা বাড়ে।মালিক এবং শ্রমিক উভয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের নীট সেক্টরের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিকেএমইএ বদ্ধ পরিকর।

“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার”

মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর প্রাদুর্ভাব রুখতে সারাবিশ্ব এখন একযোগে লড়ছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং পেশাগত দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হ্রাসকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর উদ্যোগে প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী World Day for Safety and Health at Work পালন করা হয়। করোনা ভাইরাসসৃষ্ট মহামারি মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী সরকার, শ্রমিক, মালিক এবং সমগ্র সমাজ যে অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তা বিবেচনায় নিয়ে আইএলও কর্তৃক বিশ্বব্যাপী এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: “Anticipate, prepare and respond to crises. Invest now in resilient OSH systems.”

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা সকল কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিধানসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর উদ্যোগে বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবছরও ২৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস (OSH Day) পালিত হচ্ছে। এ বছর জাতীয়ভাবে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- “মুজিববর্ষের অঙ্গীকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার”। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র যুক্তরাজ্য, কানাডা ও নেদারল্যান্ডস দিবসটি পালনে গত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও সহায়তা প্রদান করছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি রোধে কার্যক্রম গ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা কৌশল ও স্বাস্থ্যবিধি পালন করে শ্রমিক ভাই-বোনদের জীবন রক্ষার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখাসহ বৈশ্বিক সমৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখার জন্য আইএলও এবছর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, “বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আর অন্যদিকে শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।” বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে

কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং শ্রমখাতকে স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের পাশাপশি মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষকে আন্তরিকভাবে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পালনে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক:

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে মালিকপক্ষের করণীয়:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক কারখানার মেঝে, দরজার হাতল, প্রক্ষালণকক্ষ, রান্নাঘর ও ক্যাফেটেরিয়া জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- শ্রমিক ও কর্মচারীদেরকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ, সাবান, পরিস্কার পানি সরবরাহপূর্বক তা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- শ্রমিকদের মাঝে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কোন শ্রমিক কফ, শ্বাসকষ্ট, জ্বর অনুভব করলে তাকে স্বাস্থ্যবিধি পালনপূর্বক আইসোলেশনে থাকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে প্লাস্টিক ব্যাগ সংবলিত ওয়েস্ট বিন, গ্লাভস, এবং সার্জিক্যাল মাস্ক সরবরাহ করতে হবে। সেইফটি কমিটি, পার্টিসিপেশন কমিটি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটিকে করোনা প্রতিরোধে কার্যকর করতে হবে।
- জরুরি পরিস্থিতিতে করোনা পরীক্ষা করার জন্য শ্রমিকদেরকে সহায়তা করতে হবে। কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং শ্রমিকদের জন্য সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- করোনা বিষয়ক কন্ট্রোল রুম ও হটলাইন চালুপূর্বক তা কার্যকর করতে হবে। কারখানার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে তৎপর রাখুন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পিপিই সরবরাহ নিশ্চিত করুন। শ্রমঘন এলাকায় করোনা প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যকরী কমিটি গঠন করুন।
- প্রয়োজনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে শ্রমিকপক্ষের করণীয়:

- করোনা মহামারি রোধে স্বাস্থ্যবিধি ও মালিকপক্ষের আইনসিদ্ধ নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা পালনে মালিকপক্ষকে সহায়তা করুন।
- করোনা উপসর্গ গোপন না করে মালিকপক্ষকে জানাতে হবে এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।
- প্রয়োজনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১৬৩৫৭ নম্বরে যোগাযোগ করুন। করোনা সংক্রমণ রোধে শ্রমখাতকে স্থিতিশীল রাখতে আন্তরিক হোন।

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণ প্রতিরোধে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ:

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এর কোভিড প্রটোকল বাস্তবায়নে অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোকে নির্দেশনা প্রদান।
- আইএলও'র সহায়তায় 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে তা দেশের সকল শ্রমঘন এলাকায় অবস্থিত কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রয়াসে শ্রমঘন এলাকার কারখানাসমূহে ২০০০০০ (দুই লক্ষ) সচেতনতামূলক লিফলেট, পোস্টার প্রেরণপূর্বক কারখানার ফটক, দর্শনীয় স্থান ও জনসমাগম স্থানে টানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে করোনা ভাইরাস প্রিভেন্টিভ কমিটি গঠন এবং কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। কমিটিসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করছেন।
- অধিদপ্তরের এমবিবিএস ডাক্তারগণের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। চিকিৎসকবৃন্দ শ্রমিকদেরকে মুঠোফোনে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করছেন।
- ডাইফের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধে কাজ করছেন।
- শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ ও করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সমস্যা জানানোর জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১৬৩৫৭ চালু রয়েছে।
- অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্প পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ফোর্স-এর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ইতোমধ্যে শ্রমিক সংগঠন ও মালিকপক্ষের সঙ্গে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।
- দেশের শ্রম পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার জন্য কারখানা মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
- শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারখানা চালু রাখার ব্যাপারে কারখানার মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- শ্রম অসন্তোষ ও করোনা সংক্রমণ এড়াতে শ্রম আইন ও বিধি অনুসারে শ্রমিকদের বেতনাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে কারখানা মালিকপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে ও তদারকি করা হচ্ছে।
- শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধকরণ এবং শ্রম অসন্তোষ নিরসনে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর কার্যক্রম

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ডাইফ-এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপ:

- কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৭৩২৭ টি পরিদর্শন সম্পন্ন।
- ২৯৪৫ টি শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং ২৯০২ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ৮৪৭২ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান এবং ২৫,২১৮ টি লাইসেন্স নবায়ন।
- বিভিন্ন কারখানায় ৯০২টি সেইফটি কমিটি গঠন।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৬৭ টি শিশুকক্ষ স্থাপন।
- দুর্ঘটনায় আহত এবং নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮৭,২২,৫০০ টাকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ১৬৬০ টি কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে।
- শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ১৬৬৭ টি মামলা দায়ের।
- গণশুনানীর মাধ্যমে ৭৮৩ জন সেবা প্রত্যাশীর ৭৭২ টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ১০,৯৬১ জন শ্রমিককে মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা বাবদ ৩৬,৭৯,৩৪,৭৪৩ টাকা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- ৮০ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান এবং ৬২ টি লাইসেন্স নবায়ন।

- স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য ৭৬০ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা।
- লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ ৫,০৩,৪৯,২৩১ টাকা রাজস্ব আয়।
- ২০১৯ সালে ২৪ টি কারখানাকে 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার' প্রদান।
- শিশুশ্রম নিরসনে মালিকপক্ষকে সম্পৃক্ত রেখে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন।

নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ডাইফ নিম্নোক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে:

ক) **"Strengthening Labour Inspection System of Bangladesh including OSH, communication, knowledge management and gender."**-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)'র সহযোগিতায় OSH Profile অনুমোদন, DIFE SOP চূড়ান্তকরণ, খসড়া NPA on OSH প্রণয়ন, আরসিসি প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদান, লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (LIMA) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, জেন্ডার রোডম্যাপ প্রণয়নসহ বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে ও চলমান রয়েছে ।

খ) **"রিমিডিয়েশন কোঅরডিনেশন সেল-এ ন্যাস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন"**-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের মোট ২৬৫২টি তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার (জাতীয় উদ্যোগের আওতায় মূল্যায়িত ১৫৪৯টি এবং অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স-এর মোট ১১০৩টি) সংস্কারকাজ তদারকি করা হচ্ছে। পরিদর্শনের পাশাপাশি আরসিসির আওতাধীন কারখানাসমূহের ড্রইং ও ডিজাইন পর্যালোচনা এবং বুয়েটের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে উক্ত ড্রইং-ডিজাইন অনুমোদন করা হচ্ছে।

গ) বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে **"Gender Equality and Women's Empowerment at Work"** প্রকল্পের আওতায় শ্রম পরিদর্শক, শিল্প পুলিশ ও আইআরআই প্রশিক্ষকদেরকে কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে গার্মেন্টস, চামড়াজাত ও চা বাগান কারখানায় শ্রমিকদের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক সংখ্যক সচেতনতামূলক উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

ঘ) **"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOHSRTI) স্থাপন"**-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহীতে অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঙ) **স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর কো-অপারেশন প্রজেক্ট, ডেনমার্ক-বাংলাদেশ**-এর সহযোগিতায় ১২ জন শ্রম পরিদর্শককে ডেনমার্কে ছয় সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেনশন, কেমিক্যাল সেইফটি, মেশিনারি সেইফটি ও আর্গোনোমিক্স বিষয়ক চারটি ন্যাশনাল গাইডলাইন OSH কাউন্সিলের মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। DWEA-DIFE মাস্টার ট্রেনিং সম্পন্ন করার পর ডাইফ-টু-ডাইফ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চ) এছাড়াও, ডাইফ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা যথা জিআইজেড, GAIN ইত্যাদির সঙ্গে কাজ করছে।

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) মহামারি থেকে আমাদের সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সংকটে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে এবং সবাইকে নিয়েই বাঁচতে হবে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, Every cloud has a silver lining. করোনা দুর্যোগ একদিন কেটে যাবে এবং নিশ্চিতভাবেই আবার সম্ভাবনার আলো উদ্ভাসিত হবে। সবার জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকল্পে আমাদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার সংস্কৃতি নিয়মিত চর্চা করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন মালিকের সদিচ্ছা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা। তবেই আমরা একদিন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

অগ্রযাত্রায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: সাজ্জাদ হোসাইন
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল
মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, নদীভাঙন, টর্নেডো ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকা আজ হুমকির সম্মুখীন। ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। ঘনবসতি, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ দালান কোঠা নির্মাণের ফলে শহর ও নগর এলাকায় ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ড, সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী সেবা বাহিনী হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর । দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় আমাদের সাফল্য থাকলেও প্রতিনিয়ত নতুন হুমকি ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা। দেশে দ্রুত নগরায়ন, শিল্পায়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার এবং ক্রমবর্ধমানহারে বহুতল/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ নতুন মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা আমাদের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছি। এ স্বপ্ন পূরণ করতে হলে সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ কর্মজীবী সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করা একটি অন্যতম শর্ত। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করে শিল্প কারখানায় কর্মরত সকলের নিরাপত্তা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা বজায় রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব। দেশের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিশ্চিত করাসহ নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে সকল মহলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন মালিক ও ব্যবহারকারী সকলকে নিরাপত্তা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে । শুধু সরকারি উদ্যোগে সকলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা রক্ষা করার পাশাপাশি পেশাগতকাজে নিয়োজিতদের জন্য শতভাগ নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাটা দুরূহ। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এ বিষয়ে আন্তরিক ও

যত্নবান হতে হবে। আমি মনে করি, এই লক্ষ্য পূরণে দেশব্যাপী বিপুল জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টিতে **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১** উদযাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য হলো যেকোনো মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির সংখ্যা সহনীয় ও গ্রহণীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা। একই সঙ্গে বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এরই প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের যুগান্তকারী ঘোষণা দিয়েছেন। সেই ঘোষণা বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে আছি আমরা। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে সারা দেশে মোট ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ছিল ২০৬টি, বর্তমানে চালুকৃত ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৪৫৬টি। প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে ফায়ার স্টেশনের মোট সংখ্যা হবে ৫৬৫টি। আমাদের সামর্থ্যের সবটুকু কাজে লাগিয়ে জাতির জন্য সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা বিধান করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এখন বহুমাত্রিক সেবাকাজে নিয়োজিত। বর্তমান সরকার আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আমাদের সেবার মান ও সামর্থ্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি আমাদের সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। আমরা এখন অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের পাশাপাশি জঙ্গি দমন অভিযানে অংশগ্রহণ, নৌযান দুর্ঘটনায় ডুবুরি কর্তৃক উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা, দেশি-বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অগ্নি নিরাপত্তা প্রদান, হাইওয়েসহ দেশের ৯২টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দ্রুত সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে অগ্রবর্তী অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকারী দল মোতায়েন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বহুতল ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অগ্নি প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা এবং জাতীয় প্রদর্শনী ও মেলাসমূহের নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করে আসছি। আমরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারী, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরতদের অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছি। এছাড়া অন্য সকল পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আমরা ভূমিকম্প বা মেগা ডিজাস্টার মোকাবেলা করার লক্ষ্যে সারা দেশে ৬২ হাজার আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে ৪৬,৭৫৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে। এদের ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের প্রতিটি ফায়ার স্টেশনে তাদের জন্য উদ্ধার সরঞ্জাম মজুদ রাখা হয়েছে। পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ফায়ার সায়েন্স এন্ড অকুপেশনাল সেইফটি কোর্স এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীনে ফায়ার সেইফটি ম্যানেজার কোর্স চালু করেছে। এ পর্যন্ত ০৯ টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় ফায়ার সেইফটি ম্যানজোর কোর্সে ৭৩৫ জন এবং ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেইফটি কোর্সে ৮২৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রতিটি ফায়ার স্টেশনকে এক একটি ডিজাস্টার রেসপন্স ক্লাবে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে অত্র অধিদপ্তরের। পেশাগত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অত্র অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG)-এর গাইডলাইন অনুসারে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে আন্তর্জাতিক মানের Urban Search & Rescue Team (USAR Team) গঠন করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বছরব্যাপী অগ্নি প্রতিরোধসহ দুর্যোগ-দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, কলকারখানা, পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বস্তি এলাকায় অগ্নি দুর্ঘটনা রোধকল্পে নিয়মিত পরিদর্শন, গণসংযোগ, মহড়া অনুশীলন ও পরামর্শ প্রদান; অগ্নি নিরাপত্তার শর্তে বহুতল ভবনের ছাড়পত্র প্রদান; জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে হাট-বাজার, মার্কেট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, গণসংযোগ, মাইকিংসহ নানা ধরনের কর্মসূচি পালন; ওয়্যারহাউজ ও ওয়ার্কশপসমূহের অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নপূর্বক ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা; দেশের কি-পয়েন্ট ইন্সটলেশনসহ সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন এবং অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান

করা; ফায়ার স্টেশনের আওতাধীন এলাকাসমূহে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করা ইত্যাদি। এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত SOD (Standing Order on Disaster) অনুসারে অন্যান্য বাহিনীর সমন্বয়ে নিয়মিত যৌথ মহড়া ও অনুশীলনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে।

আমরা সকলে জানি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়নের ছোঁয়া দৃশ্যমান যা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের অগ্নিকান্ডের পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যাবে যেখানেই একটি দেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ধাবিত হয় তখন এর সাথে সাথে নতুন নতুন অগ্নি ঝুঁকি যেমন : জীবনযাত্রায় উচ্চ দাহ্যবস্তুর ব্যবহার, ইন্টিরিয়র ডেকোরেশনে ঝুঁকিপূর্ণ উচ্চ দাহ্যবস্তুর ব্যবহার, ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনুনোমোদিত বহুতল ভবন নির্মাণ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, অপ্রশিক্ষিত কর্মী দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যালের অনিরাপদ ব্যবহার, আবাসিক এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ কেমিক্যাল ও শিল্প কারখানার অবস্থান, মিক্সড অকুপেন্সী ভবনের আধিক্য, অনিরাপদ ও অনুনোমোদিত ইলেকট্রনিক্স ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার, অপ্রশস্ত রাস্তাঘাট, ট্রাফিক জ্যামসহ অনেক ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকিসমূহ মানুষের জীবনযাত্রার সাথে যুক্ত হতে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্নি দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রয়োজন যথোপযুক্ত অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থা। আমরা বিশ্বাস করি অগ্নি প্রতিরোধ নির্বাপণের চেয়ে উত্তম। তাই সময় এসেছে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা, অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি, প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও করণীয় বিষয়ে জনসচেতনতা, প্রশিক্ষণ, মহড়া, নিয়মিত পরিদর্শন, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থাদির রক্ষণাবেক্ষণ, স্ট্রিট হাইড্রেন্ট স্থাপন, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার বাস্তবায়ন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধির জনসংযোগ ও তদারকি এবং সর্বোপরি অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সামাজিক অনুশীলনের অংশ হিসেবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠুক এই আশাবাদ ব্যক্ত করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন । বাংলাদেশ চিরজীবি হোক ।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

ডাঃ মোঃ শফিউর রহমান
বিভাগীয় প্রধান, পেশা ও পরিবেশ স্বাস্থ্য বিভাগ, নিপসম, ঢাকা ।

ধারাবাহিক একটা সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। স্বাধীনতার পর বিধ্বস্ত দেশ, বিধ্বস্ত অর্থনীতি মানুষকে গতানুগতিক কৃষি পেশার বাইরে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প পেশা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

স্বাধীনতার পরের বছর মাত্র ৩৪ কোটি ৮৪ লাখ মার্কিন ডলারের রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশে। তার মধ্যে ৯০ শতাংশ বা ৩১ কোটি ৩০ লাখ ডলারের পণ্যই ছিল পাট ও পাটজাত। পাটের পর প্রধান রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল চা ও হিমায়িত খাদ্য। যদিও মোট রপ্তানিতে এ পণ্য দুটির অবদান ছিল সোয়া শতাংশের কাছাকাছি।

৫০ বছর আগের পণ্য রপ্তানি চিত্রের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির চেহারার খোলনলচে বদলে দিয়েছে তৈরি পোশাক খাত । পাটকে হটিয়ে পণ্য রপ্তানির শীর্ষস্থান দখল করেছে পণ্যটি। পাঁচ দশকের ব্যবধানে রপ্তানি আয় ৯৬ গুণ বৃদ্ধি, প্রায় ৪০ লাখ গ্রামীণ নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান, নারী ক্ষমতায়ন, সহযোগী শিল্পের বিকাশসহ অনেক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে পোশাকশিল্প। চীনের পর একক দেশ হিসেবে দ্বিতীয় শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক বাংলাদেশ। পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানার সংখ্যার দিক থেকেও বিশ্বে সবার ওপরে বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশেও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে তৈরি পোশাক খাত বড় বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শক্ত ভীত গড়েছে বিশ্ববাজারে।

অথচ স্বাধীনতার পর পণ্য রপ্তানির তালিকায় তৈরি পোশাকের কোনো নাম-নিশানা ছিল না। সেই পোশাক খাতের রপ্তানি গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৩ হাজার ৪১৩ কোটি ডলারের, যা দেশীয় মুদ্রায় ২ লাখ ৯০ হাজার ১০৫ কোটি টাকা। করোনার কারণে গত অর্থবছর রপ্তানি কিছুটা কমে ২ হাজার ৭৯৪ কোটি ডলারে নেমে এসেছিল । তারপরও মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশই তৈরি পোশাকের দখলে। আর পাট ও পাটজাত পণ্যের হিস্যা কমে ২ দশমিক ৬২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান ধারা, বৈশ্বিক চাহিদা, প্রাণীকুলের টিকে থাকার সংগ্রাম, করোনায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি- সমগ্র বিশ্বকে বেঁচে থাকার সংগ্রামে সামনের কাতারে দাঁড় করিয়েছে।

করোনায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে শ্রমিক-মালিকের যৌথ প্রচেষ্টা একান্তই কাম্য। আর এর ফলে যে কোন কারখানাতেই সম্মান জনক উৎপাদন করা সম্ভব। যেহেতু কল্যাণমুখি উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সেহেতু শ্রমিকের সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও তাদের পেশাগত নিরাপত্তাদানের বিষয়টি অবশ্যই জরুরি হিসাবে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনা করা দরকার। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং পেশাগত নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা দরকার। এক কথায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা হলো, যেকোন ব্যবসায়িক শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, গার্মেন্টস কারখানা, কৃষি-খামার, চা-বাগান কিংবা অন্য যে কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এমন কোন প্রতিকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা- যা শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে কিংবা মারাত্মক কোন দূর্ঘটনা সৃষ্টি করবে।

সাধারণত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, শ্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রমিকদের শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রের রোগ ও দূর্ঘটনা বিবেচনা না করে শ্রমিকের দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াবলির দিকে লক্ষ্য রাখা। 'পেশাগত স্বাস্থ্য' বলতে যে কোন পেশায় কর্মরত সকল শ্রমিকের দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াবলী বোঝায়। পেশাগত স্বাস্থ্যের সঙ্গে 'প্রতিকার ও প্রতিরোধ' উভয় ব্যবস্থাই যুক্ত রয়েছে।

স্বাস্থ্য-সমস্যা সৃষ্টির প্রক্রিয়াঃ

সাধারণত স্বাস্থ্যের ওপর যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে হলে কোন দূষিত বস্তুকে হয় শারীরিক সংস্পর্শে আসতে হবে অথবা শরীরে প্রবেশ করতে হবে। ৩টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণত তা সম্পন্ন হয়ে থাকে ঃ

১.শ্বাস-প্রশ্বাস ।
২.সংস্পর্শ ।
৩.গলধ:করণ

দূর্ঘটনার কারণসমূহঃ

- অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ।
- যোগাযোগের অভাব।
- পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব।
- খন্ডকালীন কাজ বা ফলাফলের ভিত্তিতে মজুরী দেওয়া।
- চাপ সৃষ্টি।
- মেশিনারী ডিজাইন ও কার্যপদ্ধতিতে নিরাপত্তাহীনতা।
- অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
- নিরাপত্তামূলক পোশাক/সরঞ্জামাদি ব্যবহার বা সরবরাহ না করা।
- কাজে অন্যমনস্কতা ।

পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ঝুঁকিসমূহ ঃ

- আসা-যাওয়ার পথরোধ বা বাঁধাগ্রস্থ।
- বৈদ্যুতিক ত্রুটি।
- পিচ্ছিল পথ।
- শিখাযুক্ত বা বিস্ফোরণ ঘটায় এমন রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি।

- ভারী জিনিসপএ।
- মেশিনের তত্বাবধান বা নিরাপত্তাবেষ্টিত না থাকা।
- গরম-ঠান্ডা জিনিসপএ।
- ধারালো বা ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতির উপস্থিতি ।

যেখানেই ঝুঁকি দেখা যাক বা চোখে পড়ুক দেরি না করে তা সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে আশেপাশে বা অন্য কোন জায়গায় তা দেখা না দেয়।ঝুঁকিকে নিয়ন্ত্রণে আনার ৩টি সহজ ধাপ ঃ

- উৎপত্তি স্থানে।
- উৎপত্তি স্থান থেকে শ্রমিকের কাছে পৌছানোর পথে।
- শ্রমিকের কাছে।

ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ঃ

- কাজের জায়গা পরিদর্শন।
- অভিযোগ সংগ্রহ।
- সবচেয়ে আগে কি করা দরকার তা নির্ধারন।

কর্মস্থলে দূর্ঘটনা এড়াতে হলেঃ

- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে মাথায় হেলমেট পরে কাজ করুন।
- চোখে চশমা পরে কাজ করুন।
- হাতে গ্লাভস পরে কাজ করুন।
- পায়ে বুট জুতা পরে কাজ করুন।
- মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন।
- কর্মস্থলে নিরাপদে কাজ করুন।
- অসুস্থ্য শরীরে কাজ করা বিপদজনক।
- অসুস্থ্যবোধ করলে ফ্যাক্টরিতে অবস্থিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- কাজের সময় তন্দ্রা ঘটাতে পারে এমন ঔষধ সেবন করবেন না।
- মাদক দ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকুন।
- সুস্থ্য শ্রমিক অধিক উৎপাদনের পূর্বশর্ত।
- সর্ব প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করে মেশিন চালানো উচিত।
- কর্মস্থলে প্রয়োজনীয় ঢিলা পোশাক পরিহার করে এপ্রোন পরা বাঞ্ছনীয় অথবা ওড়না ভালোভাবে পেঁচিয়ে কাজ করুন এবং কর্মস্থলে শাড়ি পরা পরিহার করুন।
- কাজের সময় অন্য চিন্তা পরিহার করুন।
- মূহুর্তের অসাবধানতা বিপদের কারণ হতে পারে।
- কাজ শেষে হাত মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ধুয়ে ফেলুন।
- বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেটর নষ্ট হয়ে গেলে সর্ট সার্কিট হয়ে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

- কাজ শুরুর পূর্বে আপনার মেশিন ভালোভাবে এবং নিয়মিত পরীক্ষা করুন । কারখানার কোথাও কোন ত্রুটিপূর্ণ তার বা কোন মেশিন আপনার চোখে ধরা পড়লে সাথে সাথে ইলেকট্রিশিয়ানকে জানান এবং একই সঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষকেও অবহিত করুন।
- মনে রাখবেন ঝুঁকিপূর্ণ মেশিন এবং ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক তারের সর্টসার্কিট গার্মেন্টিস্ ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকান্ডের অন্যতম কারণ।
- কাজ শুরুর পূর্বে মেশিনারী নিরাপত্তা গার্ড (যেমন- নিডিল গার্ড, পুলি কভার, নীচের মটর পুলি কভার, আই গার্ড ইত্যাদি) ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা পদ্ধতি (যেমন-রাবার গ্লাভস, মেটাল গ্লাভস, মাস্ক, চশমা, ইয়ার প্লাগ, এপ্রোন ইত্যাদি) পরিধান করে কাজ করুন ।

এই নিরাপত্তা বিধান সম্পূর্ণভাবে না মেনে চললে শ্রমিক এবং মালিক উভয়েরই মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে যা সমাজ এবং দেশের জন্যও ক্ষতি বটে।

মুজিববর্ষে করোনায় বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কল কারখানায় নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যসম্মত মাসিক ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত অবকাঠামো, যেমন- টয়লেট চেম্বার, হাত ধোয়ার স্থান, পানি সরবরাহের স্থান, নারী শ্রমিকদের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন সম্পর্কে আচরণগত পরিবর্তন করাকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে।

How long can we afford to neglect the workplace risk management?

Abu Nayeem Md Shahidullah
Brig Gen (retd)
Member of National Industrial Health and Safety Council, MoLE & Member of Expert-pool, SSD, MoHA, Former DG Fire Service and Civil Defence.

A number of accidents/hazards are happend regularly in the work place like: Pier cap of the Bus Rapid Transit project in Uttara collapse. A portion of a launching girder of in Bangladesh Elevated Metro Rail project collapsed near Dhaka airport leaving six workers, including three Chinese nationals, injured [1]. Along with others, Occupational Safety and health experts have commented that this accident could have been avoided by immediately stopping the work and reviewing, 'Risk Assessment'. This has also raised questions on why not to monitor the effectiveness of the control measures and update the Risk Management plan where necessary for this project and also other ongoing mega projects of our country such as Padma Bridge, Karnaphuli Tunnel, Rooppur Nuclear Power Plant Project, Bangabandhu Railway Bridge, Hazrat Shahjalal (R) International Airport Terminal 3, Iconic Tower in Purbachal, Sheikh Hasina International Cricket Stadium, etc. Alongside mega projects, we need to review and revisit the Risk Management Plan of our factories and industrial establishments to ensure health and safety of the workforce as a matter of their fundamental rights. These mega projects have paved the way to job opportunities for millions of workforce and staffs. However, the actual statistics of the accidents in these mega projects are not found from authorized source. Yet, if we take account of the incidents mentioned in news media and other sources, we get to know that each year, these mega projects are facing a large number of accidents. It's also evident that with growing industrial production, the use of energy increases rapidly and with the increased use of energy, inevitably the number of accident also increases.

Let's look at the number fire incidents that took place in last four years in our country. In 2017, the number fire incidents were18105, in 2018 it was 19073,

in 2019 it was 24074 and in 2020 when the country undergone lockdown for a long time to cope-up with COVID-19, yet we had 21073 fire incidents [2]. If we carefully examine the statistics of the fire incidents, we can find that with the rapid increase in the use of energy and continued neglect of workplace risk management, the fire incidents increased rapidly.

An accident leads to project delays, cost overrun and substandard product which also affects economical and infrastructure development of a nation. We find the key causes of accident based on overall considerations are: lack of personal protective measures, lack of safety awareness among top management, lack of safety awareness among workers, lack of training, non-compliance of safety regulation, lack of management commitment, unskilled workers and poor safety culture etc. owing to lack of supervision and monitoring by appropriate authorized agencies. So we need to ensure a strong risk assessment and management system at every site to reduce the number of accidents and fatal cases.

To do this, we need to think about the factors that cause harm to people and decide whether we are taking reasonable steps to prevent them, essentially this is called the risk assessment, which is mandatorily required under Bangladesh Labor Law. So, risk assessment is not about creating huge amounts of paperwork rather identifying sensible measures to control the risks in a workplace. Most common steps of risk assessments steps are: Step 1. To identify the hazards and those at risk, Step 2, To evaluate and priorities the risks, Step 3. To decide on preventive actions, Step 4. To take action, and Step 5. To monitor and review the situation and update when necessary [3]. Risk assessment can help us as following:

- It is an aid to risk management in order to help make workplaces safer and healthier, and to improve our business efficiency and competitiveness.
- It allows employers with the participation of the workforce, to take actions to remedy safety and health problems and come up with cost-effective solutions.
- Using risk assessment, employers identify and evaluate the risks that arise in their workplaces and, based on their analysis, they can then put sensible safety and health measures in place.
- Risk assessment can be used to establish priorities so that the most dangerous situations are addressed first and those least likely to occur and least likely to cause major problems can be considered later; this is also cost-effective.
- Using risk assessment to tackle our daily OSH problems avoids having to over-rely on external experts which is often costly, consultants or officials to advise them what is wrong and how to solve their problems.

On the other hand, risk management is a process involving the systematic identification and analysis of hazards inherent in an activity, as well as the estimation and evaluation of the associated health risks to the workers in order to select and implement the effective measures to control the workplace risks. So we see that the risk management deals with balancing the conflicts inherent in exploring opportunities on the one hand and avoiding losses, accidents and disasters on the other [4]. We are probably already taking steps to protect our workforce, carrying out risk management will help us decide check if we have covered all we need to. We should think how accidents and ill health could occur and concentrate on real risks – those that are most likely and will cause the most harm. In case of risk concerning COVID-19 in workplace, particular control measures are to be incorporated in our risk management plan in line with concern guidelines and regulations. Our assessment can help us identify where we need to look at to avoid certain risks. These control measures do not have to be assessed separately but can be considered as part of, or an extension of, our overall risk assessment for our factories and industrial establishments.

Legal Requirement. The conduct of Risk Management is a statutory requirement in many countries including Bangladesh. Some examples are mentioned below:

Bangladesh Labor Rules. Conducting risk assessment and daily & weekly checks on OSH is one of the key functions of the Safety committee (BLR Schedule IV 4). In both cases the purpose is to identify situations which could harm workers before they occur. A risk assessment consists in a comprehensive listing of the hazards in the factory, setting priorities, and developing corresponding control mechanisms. It is time consuming, so that it cannot be conducted every day. Bangladesh legislation requires conducting it at least every 3 months (BLR 67 B 3). BLR Schedule IV 4 requires a checklist to conduct risk assessment. In this the most common hazards and control mechanisms are already listed; the persons conducting the risk assessment can just tick the hazards identified [5]. On the other hand, the constitution is the highest legislation of Bangladesh, and provides its citizens the right to freedom of association, reasonable wages, equal opportunity in employment, social security and prohibits forced labor. The constitution has indicated work as a right and duty of the citizen (articles 7, 14 and 20).

Singapore Workplace Safety and Health (Risk Management) Regulations.

Risk assessment. (Chapter 354A, Section 65, Rule 3. (1). In every workplace, the employer, self-employed person and principal shall conduct a risk assessment in relation to the safety and health risks posed to any person who may be affected by his undertaking in the workplace. Rule 5. (1) Every employer, self-employed person and principal shall maintain a record of any risk assessment conducted under regulation 3(1), and any measure or safe work procedure implemented under regulation 4(2); [6].

WHO Guidelines. COVID-19 is associated with a range of concerns, such as fear of falling ill and dying, of being socially excluded, placed in quarantine, or losing a livelihood. Symptoms of anxiety and depression are common reactions for people in the context of COVID-19. Mental health and psychosocial support should be made available to all workers. Comprehensive risk assessments can help identify and mitigate related occupational hazards for mental health. Full Guideline Document Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19 is accessible at reference [7].

Understanding Risk control hierarchy. Risk control is the process of implementing measures to reduce the risk associated with a hazard. It includes three operations; a) Decision-making, b) Implementation and c) Monitoring. The hierarchy of risk control includes the preferred general methods of risk control ranked in decreasing order of effectiveness and in the order that these should be considered and adopted [8]. For an example the situation is, in a five storage factory a newly bought Generator is producing huge sound beyond the safety limit. Worker of the 1st floor is effected the most. The owner called all his safety staff and CEO to address the situation and to take decision. Following options came up to take the right decision basing on "So far as is reasonably practicable" or by adopting "Best practicable means":

- Remove the Generator and procure powerful IPS for each floors. This is known as 'Elimination' of hazard which is the best way to completely remove the hazardous item or substance or work practice.
- Replace the Generator with world class branded Generator with high quality accessories. This is known as 'Substitution' which is to substitute the hazardous processes or substance or work practice with a safer, harmless alternative.
- Shift the Generator to nearby room or shift the worker from 1st floor to other floor to isolate the hazard. This is known as 'Isolation' which is to control the hazard or risk by enclosing it completely to prevent the hazard from reaching the worker.
- Arrange canopy or mask the generator in a manner so the noise pollution comes down to a safety level. This is known as 'Technical and engineering controls' which is done by modifying tools or equipment, or by fitting guards to machinery.
- Shift the workers from 1st floor to other floors, away from the Generator so they are in a condition of tolerable noise level. This is known as 'Administrative controls' is consisting of developing and enforcing safe work methods and practices to minimize exposure to a hazard.

- Workers are giver ear-plugs as a personal protective kit to put on and when the Generator in the operation. This is known as 'Personal Protective Equipment' which is a means of covering and protecting a worker's body from hazards.

Generally speaking, we need to do everything 'reasonably practicable' to protect people from harm. This means balancing the level of risk against the measures needed to control the real risk in terms of money, time or trouble. However, we do not need to take action if it would be grossly disproportionate to the level of risk.

Importance of risk management in connection with OHS does not require to be over emphasized. It is well understood by the catastrophic building collapse incident of Rana plaza where we lost about 1132 human lives and fire incident in Tazreen Fashion garment where we have lost about 112 human lives. We have all the reason to believe that those accidents could have been avoided with proper risk management under existing law and regulations of country at that time. These deadly historical accidents were eye openers for many of our business community members including the policy makers of Bangladesh. On the other hand, as the knowledge about COVID-19 risks further develop, risk assessments and management for workplace risk factors and individuals, particularly vulnerable subjects, will need to be reviewed from time to time. Concerted actions of general practitioners, hospital specialists, occupational physicians and all figures involved in the health and safety management in the workplace should be strongly encouraged to plan suitable preventive measures for vulnerable subjects [9].

We know that the best work systems are based on having a skilled workforce, with well-designed jobs that are appropriate to individuals' abilities. The influence of biological, psychological and organizational factors on an individual at work can affect their health and safety and it can also affect their efficiency and productivity. To improve their health and safety condition, it is not enough for the employers and workers to better learn how to manage the risk of the workplace they must also ensure a better managed, more effective organizational support. The policy makers, concern law enforcement agencies and other stakeholders will have to assume active participation and proactive role on this serious issue of safe guarding people's lives and ensuring smooth running of much needed developmental work of Bangladesh.

References:

1. Bangladeshi News Paper: The Daily Star, March 15, 2021
2. Bangladesh Fire Service and Civil Defence, official Website.
3. Risk Analysis: Assessing Uncertainties beyond Expected Values and Probabilities T. Aven, 2008 John Wiley & Sons, Ltd ISBN: 978-0-470-51736-9
4. Health and Safety Executive: A brief guide to controlling risks in the workplace www.hse.gov.uk/pubns/indg163.htm.
5. Bangladesh Labor Rules 2015 - Schedule IV
6. Singapore Workplace Safety and Health (Risk Management) Regulations Chapter 354A, Section 65, Rule 3. (1), 5 (1), 4 (2).
7. https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
8. ILO Workplace Risk Assessment and Management for Small and Medium-Sized Enterprises. First published 2013
9. https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/COVID-19_Return_to_Work_Guide_for_Occupational_Health_Professionals.html (accessed on 31March 2021).

প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন, ব্যবহার, বর্জ্যব্যবস্থাপনা এবং শিল্প কারখানার পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যঝুঁকিঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট ও আমাদের করণীয়

ড. মোঃ ইয়াছির আরাফাত খান
সহযোগী অধ্যাপক
কেমিকৌশল বিভাগ
বুয়েট, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশে এখন প্লাস্টিক সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা শহরের একজন মানুষের প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ বছরে পনের (১৫) কেজি যা কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্লাস্টিক সামগ্রীর বর্তমান বাজার আনুমানিক ত্রিশ হাজার কোটি টাকা। দেশে ছোট বড় মিলে মোট পাঁচ হাজার (৫০০০) প্লাস্টিক তৈরির শিল্প কারখানা রয়েছে। এই কারখানাগুলোতে তৈরি হয় প্রায় ষাট (৬০) কোটি টন প্লাস্টিক সামগ্রী। এখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষ। গত কয়েক বছরে ১৫% হারে প্লাস্টিক সেক্টর বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজস্ব চাহিদা ও ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে প্লাস্টিক সামগ্রীর রপ্তানিও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১৯ সালে দেশের প্লাস্টিক সামগ্রীর রপ্তানি ৪০ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১২০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

দেশীয় চাহিদা ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি বিবেচনায়, বাংলাদেশ সরকার প্লাস্টিক শিল্প কারখানাগুলোকে “Highest Priority” সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং এর প্রেক্ষিতে “জাতীয় প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০২০” (National Plastic Industry Development Policy 2020-) প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার উদ্দেশ্য প্লাস্টিক সেক্টরের ১৫% বৃদ্ধি সমুন্নত রাখা, প্লাস্টিক শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে ২০২৬ সালের মধ্যে প্লাস্টিক সামগ্রীর বাজার আশি হাজার কোটি ও ২০৩০ সালের মধ্যে প্লাস্টিক সামগ্রীর বাজার একলক্ষ ষাট হাজার কোটি টাকাতে উন্নীত করা। এছাড়াও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বার্ষিক জিডিপি উন্নয়নে প্লাস্টিক সেক্টরের ভূমিকা বৃদ্ধি করা।

একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্লাস্টিকের উপর মারাত্মকভাবে নির্ভরশীল এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এই মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ESDO-এর তথ্যমতে, কোভিড-১৯ এর শুরুতে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে দেশে ৪৫.৫ কোটি সার্জিক্যাল মাস্ক, ১২১.৬ কোটি পলিথিন হ্যান্ড গ্লাভস, ১৮.৯ কোটি সার্জিক্যাল হ্যান্ড গ্লাভস, ১৪৪.৯ কোটি

পলিথিন ব্যাগ ও ৪.৯ কোটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর বোতল ব্যবহৃত হয়েছে। এ সকল পণ্য সাধারণত একবার ব্যবহার করেই ফেলে দেয়া হয় যার ফলে শুধু এই এক মাসেই ব্যবহৃত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ ১৪,১৬৫ টন। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে একবার ব্যবহৃত উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ চিত্র-১ এ দেখানো হয়েছে। সর্বোচ্চ ব্যবহৃত পণ্য পলিথিন ব্যাগ যা মোট উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের প্রায় ৪১%।

চিত্র ১ ২০২০ সালের এপ্রিলে উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ

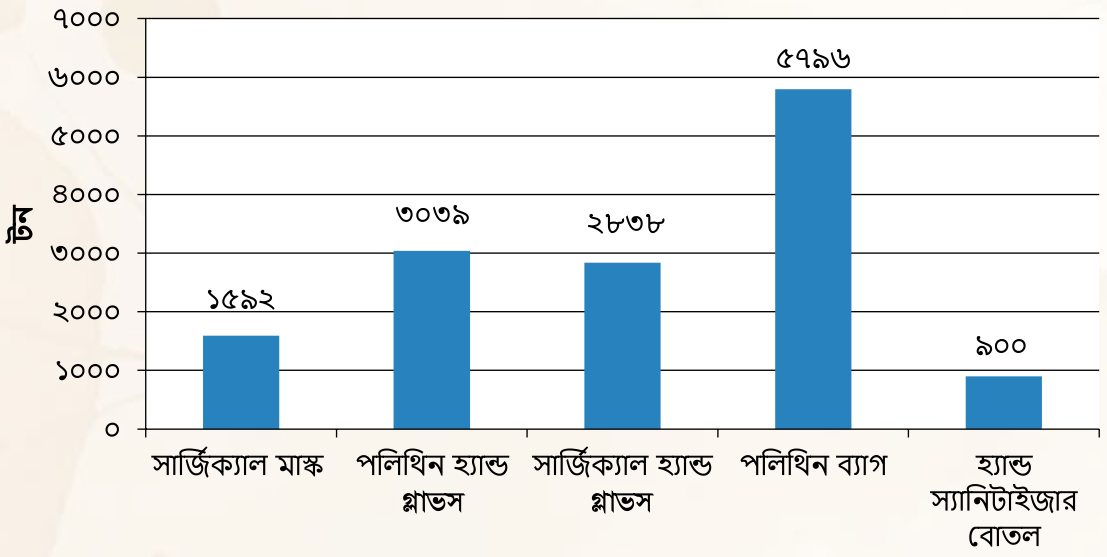

সূত্রঃ ESDO report, May 2020

বাংলাদেশে প্রতিদিন মোট উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ ২২৫০ টন যার মধ্যে ৫৭০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশে ফেলে দেয়া হয় কোন রকম ব্যবস্থাপনা ছাড়াই । দেশে প্লাস্টিক শিল্পের উন্নতির পাশাপাশি প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তেমন উন্নতি হয়নি। ২০১০ সালে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যবহৃত প্লাস্টিক বর্জ্য এর পরিমাণ অনুসারে ১৯২ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দশম। দেশে উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের ৩৫-৩৮% রিসাইক্যাল করা হয় (সূত্রঃ waste concern)। বাকি ৬২-৬৫% এর মধ্যে ৪০% ফেলা হয় ল্যান্ডফিলের নির্ধারিত স্থানে এবং বাকি অংশ কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই পরিবেশে ফেলা হয় যা মারাত্মক পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে।

Table 1 List of monomer and other chemicals used in production of plastics

	Polymer Types	Monomer	Solvent	Others
1	PET	Ethylene glycol Dimethyl terephthalate	Dichloro- methane	zinc oxide, by-product: Methanol
2	HDPE	Ethylene	Toluene Cyclohexane N-hexane, Heptane Gasoline, Chlorobenzne isooctane	Chromium (IV) oxide Silica Titanium tetrachloride Triethylaluminium
3	PVC	Vinyl chloride	Polyvinyl alcohol	2,2 azobisisobutyronitrile Ammonium persulphate Benyl butyl phthalate Dibutyl phthalate Bis(2-ethylhexyl) phthalate Cadmium
4	LDPE	Ethylene	Benzene Ethanol Methanol	Benzoyl peroxide Di-tert-butyl peroxide 2,2 azobisisobutyronitrile
5	PS	Styrene	Ethyl benzene	2,2 azobisisobutyronitrile Benzoyl peroxide p-benzoquinone Potassium persulphate
6	ABS	Acrylonitrile 1,3 butadiene Styrene	--	Tert butyl perbenzonate Ammonium oleate
7	PC	Bisphenol A Phosgene (carbonyl chloride)	Dichloro- methane	Pyridine, zinc oxide, by-product:phenol

প্লাস্টিক মূলত বিভিন্ন পলিমার রেজিন ও অ্যাডিটিভস এর সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে (টেবিল-১)। এছাড়া প্লাস্টিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক, সলভেন্ট ও ক্যাটালিষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ফলে প্লাস্টিক উৎপাদন, ব্যবহার, রিসাইক্যাল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে এ সকল কেমিক্যালের নিঃসরণ হতে পারে। তাই প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহৃত কেমিক্যালের নিঃসরণ পরিবেশ, ইকোসিস্টেম এবং স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ।

এছাড়া প্লাস্টিক উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক বেশ বিষাক্ত এবং ভয়াবহ দাহ্য। প্লাস্টিক শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত বিষাক্ত ও উদ্বায়ী সলভেন্ট (হেক্সেন, টলুইন, বেনজিন, জাইলিন, মিথানল) এর উপস্থিতি কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে দূষিত করতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস ও চামড়ায় শোষণের মাধ্যমে এ সকল রাসায়নিক পদার্থ মানব দেহে প্রবেশ করতে পারে। তাই নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে, ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি সঠিকভাবে নিরুপণ করা জরুরি। তাছাড়া এসকল দাহ্য রাসায়নিক এর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে না পারলে যে কোন সময় ঘটতে পারে ভয়াবহ অগ্নি-দুর্ঘটনা কিংবা

বিস্ফোরণের ঘটনা। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে, গাজীপুরের টঙ্গিতে অবস্থিত টাম্পাকো ফয়েল লিঃ এর ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নি-দুর্ঘটনায় মারা যায় ৪০ জন শ্রমিক ও ৩ জন পথযাত্রী। ১২৫ জন অগ্নিনির্বাপক কর্মীর ৩৬ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। কারখানাটিতে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক তৈরির কাঁচামাল, সলভেন্ট ও দাহ্য পদার্থ মজুদ থাকায় আগুন নেভানো ছিল বেশ কঠিন। প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহৃত পলিমার রেজিন সাধারণ তাপমাত্রায় বিপজ্জনক না হলেও, আগুনের সংস্পর্শে এলে সহজে তা তরল দাহ্য পদার্থে পরিণত হয়।

চিত্র ২ কেরানীগঞ্জ প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, ডিসেম্বর, ২০১৯

সূত্রঃ The Finance Today

রাজধানী ঢাকার আশেপাশে এমনকি আবাসিক এলাকার ভিতরে গড়ে উঠেছে অনেক ছোট ছোট প্লাস্টিক কারখানা। যেখানে নেই নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পর্যাপ্ত অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কেমিক্যাল সেইফটি বিষয়ে দক্ষতা ও সচেতনতা। তাই অগ্নি-দুর্ঘটনা এখানে অস্বাভাবিক নয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার কেরানীগঞ্জের আবাসিক এলাকায় অবস্থিত প্রাইম পেট এ্যান্ড প্লাস্টিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ২২ জন শ্রমিক মারা যায় ও আহত হয় আরো অনেকে। অগ্নিকান্ডে অনেক শ্রমিক কারখানার মধ্যে আটকা পড়ে এবং মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়। তাছাড়া প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহৃত অনেক কাঁচামাল ও পলিমার রেজিন আগুনে পুড়লে বিষাক্ত ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। এই বিষাক্ত ধোঁয়ায় থাকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের (এসিটাল্ডিহাইড, বেনজন, ফসজিন, স্টাইরিন, টলুইন ও জাইলিন ইত্যাদি) উপস্থিতি, যা মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে, এ সকল কারাখানা চিহ্নিত করা, আবাসিক এলাকা থেকে নিরাপদ শিল্প অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা এবং রাসায়নিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ অতীব জরুরি।

প্লাস্টিক সামগ্রী অনেকটাই নিস্ক্রিয় ধরনের এবং পচনশীল নয়। তাই নিয়ন্ত্রণহীন প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্যে হুমকিস্বরুপ। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশে ফেলে দেয়া হয়। শুধু ঢাকাতে উৎপাদিত প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ ৫৫০ টন। নিয়ন্ত্রণহীন প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশে ফেলায় শহরে একটু বৃষ্টিতে দেখা দেয় জলাবদ্ধতা। প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক শোষণ করে নেয় যা অবশেষে নদী বা সাগরের পানিতে গিয়ে দূষণ সৃষ্টি করে। আবার পরিবেশে বিভিন্ন বিক্রিয়া ও ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে তৈরি হয় মাইক্রো-প্লাস্টিক (৫ মাইক্রো মিটার থেকে ছোট)। নদীর পানি, সাগরের পানি, খাবার পানি ও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে এই মাইক্রো-প্লাস্টিক এর উপস্থিতি সনাক্ত হয়েছে।

Table 2 Harmful chemical that may release from plastic wastes

Toxic Additives	Uses	Health Effects	Plastic Type
Bisphenol A	Plasticizers	can liner Mimics oestrogen, Ovarian disorder	Polyvinyl chloride (PVC), Polycarbonate (PC)
Phthalates	Plasticizers	artificial fragrances Interference with testosterone, sperm motility	Polystyrene (PS), Polyvinyl chloride (PVC).
Persistent Organic Pollutants (POPs)	Pesticides, flame retardants	Possible neurological and reproductive damage	All plastics
Dioxins	Formed during low temperature combustion of PVC	Carcinogen, interferes with testosterone	All plastics
Polycyclic aromatic Hydrocarbon (PAHs)	Use in making pesticides	Developmental and reproductive toxicity	All plastics
Polychlorinated biphenyls (PCBs)	Dielectrics in electrical equipment	Interferes with thyroid hormone	All plastics
Styrene monomer	Breakdown product	Carcinogen, can form DNA adducts	Polystyrene
Nonylphenol	Anti-static, anti-fog, surfactant (in detergents)	Mimics oestrogen	PVC

মানুষের একটা সরল বিশ্বাস যে, প্লাস্টিক সামগ্রী খুব একটা ক্ষতিকর নয় অথবা এর ব্যবহারে কোন স্বাস্থ্যঝুঁকি নেই। অথচ প্লাস্টিকে ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক, মাইক্রো-প্লাস্টিক ও এতে শোষিত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন মাধ্যম হয়ে (শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্যদ্রব্য, মাছ-মাংস ও পানির মাধ্যমে) মানব দেহে প্রবেশ করতে পারে (টেবিল-০২)।

তাই প্লাস্টিক এর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় রেখে উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি। বাংলাদেশে ২০০২ সালে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ হলেও, এ পণ্যের ব্যবহার বেড়েছে বহুগুণে। তাই উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও তার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে না পারলে প্লাস্টিক সেক্টরের এই উন্নয়ন টেকসই হবে না। সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ও সার্কুলার ইকোনোমি বিবেচনায় রেখে প্লাস্টিক সেক্টরের উন্নয়নের টেকসই রুপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। রিডাকশন, রিইউজ, রিসাইক্যাল ও সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। প্লাস্টিক শিল্পের টেকসই উন্নয়নে প্লাস্টিক পণ্যের সার্কুলারিটি বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি, প্রস্তুতকারকদের পণ্যের গুণগত মান, ক্ষতিকর রাসায়নিক এর ব্যবহার এবং এর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় নিতে হবে। প্লাস্টিক পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত সকল রাসায়নিকের বিবরণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য, সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা উল্লেখ করতে হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে প্লাস্টিক সামগ্রীর উৎপাদন, ব্যবহার ও বর্জ্যের সঠিক তথ্য নিরূপণ করতে হবে। প্লাস্টিক বর্জ্যের নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাইক্রো-প্লাস্টিকের উৎপত্তি ও ক্ষতিকর রাসায়নিকের পরিবেশে নিঃসরণ কমানো সম্ভব।

এছাড়া প্লাস্টিক পণ্যের পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে সরকার, NGO, সোস্যাল মিডিয়া, ইলেক্ট্রোনিক/প্রিন্ট মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নিরাপদ রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনবল তৈরিতে শিক্ষা ও গবেষণা খাতে গুরুত্ব দিতে হবে। ক্ষতিকর রাসায়নিকের বিকল্প, বায়ো-প্লাস্টিক তৈরি ও টেকসই বর্জ্যব্যবস্থাপনা ইত্যাদি খাতের গবেষণায় বিনিয়োগ করতে হবে।

শিল্প কারখানা গুলোতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দুর্ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ, প্রকৃত কারণগুলো অনুসন্ধান, প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন ও বিতরনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে একই রকম দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

বর্তমানে প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত ও অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় দৈনন্দিন ব্যবহৃত এ সকল পণ্য উৎপাদনে ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার সঠিকভাবে মনিটর করা দরকার। যে সকল প্লাস্টিক পণ্য সরাসরি খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও বাচ্চাদের সংস্পর্শে আসে, সেগুলো উৎপাদনে ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

Ensuring Occupational Safety and Health (OSH) in Bangladesh's RMG sector in the time of COVID-19

Anne-Laure Henry-Greard
Programme Manager
Better Work Bangladesh

Since emerging as a global crisis in early 2020, the COVID-19 pandemic has had profound impacts on Bangladesh's ready-made garment (RMG) sector. The pandemic has affected nearly every aspect of this sector, from the risk of transmission of the virus in factories, to heightened occupational safety and health (OSH) needs to mitigate the spread of the virus. Shifts to new forms of working arrangements, such as virtual learning, have, for example, presented many opportunities for the sector but the factory floors remain vulnerable to potential OSH risks including psychosocial risks and violence in particular.

The pandemic has forced the industry to redefine the fundamental aspects of OSH and deploy new resources to control the spread of COVID-19 in workplaces. Although factories took steps towards minimising the risks of COVID-19 infection, in some cases, occupational safety and health measures were implemented inconsistently as there has been a substantial lack of understanding of the crisis.

This year's World Day for Safety and Health at Work comes during a 'second wave' of the COVID-19 pandemic in Bangladesh and around the world. How we protect the workers will clearly dictate how resilient Bangladesh's RMG businesses will be, as this pandemic evolves.

Supporting OSH measures for a sustainable recovery from COVID-19

Seven years into its existence, Better Work Bangladesh (BWB), a joint programme of the International Labour Organization (ILO) and International Finance Corporation (IFC), has a significant and long-lasting impact on Occupational Safety and Health in Bangladesh's garment industry. Our partner factories have been demonstrating the commitment and capacity to maintain continuous improvement in OSH conditions by taking ownership of the improvement process.

As garment factories resumed operating at full scale, Better Work Bangladesh has shifted its focus to helping the industry maintain its path to recovery from the disruption caused by COVID-19.

With workplace health and safety remaining the highest priority in our support to the industry, Better Work's approach to COVID-19 recovery has been based on the application of international labour standards, improvement in working conditions, industrial safety and social dialogue.

Before the onset of the crisis, BWB started preparing short and long-term plans to support affiliated factories. Interventions particularly focused on COVID-19 response and the continuity of our factory services remotely to help factories cope with this entirely changed reality. Our initial response focused on helping our partners adapt their OSH efforts by:

- Installing handwashing facilities and making sure the workers and employees wash their hands at regular interval;
- Conducting awareness sessions for management, in-house doctors, welfare officers, participation committee (PC) members, safety Committee members and workers to make them aware of individual and collective responsibility to protect them and others;
- Cleaning and disinfecting of the workplace to prevent the spread of COVID-19;
- Ensuring mass circulation of safety guidance (in local language) and engaging Safety Committees to develop action plans;
- Providing practical advice and legal guidance to respond to unexpected compliance issues resulting from the COVID-19 pandemic.

Taking into account the national regulations and realities, our approach prioritised mitigating the health and economic impacts of COVID-19 on productivity, factories and workers.

Based on those priorities, Better Work released a number of guidances including the COVID-19 Management Guidance document, HR Guidelines and the Transitions and Retrenchments Guidelines to help factories reduce the risk of coronavirus and take practical measures to navigate the disruptions caused by the crisis.

Launched in July 2020, the RMG Learning Hub continues to harmonise the ILO's response to COVID-19 in the RMG industry, supported by the national stakeholders including the BGMEA, BKMEA and the Workers Resource Centre (WRC).

Better Work Bangladesh has also partnered with the German Government-supported Vision Zero Fund (VZF) to support occupational safety and health (OSH)-oriented actions in the RMG industry to strengthen the national efforts for facilitating a safe continuation of work during the COVID-19. Under this initiative, BWB is implementing a series of initiatives to strengthen the capacity of the in-house clinics and raise awareness of COVID-19 among workers and factory management. To improve industry capacity for mitigating COVID-19 risks in the workplace, PPE will be provided to healthcare workers, pregnant and lactating mothers.

In collaboration with the Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in the Bangladesh Ready-Made Garment Industry (SDIR) Project of the ILO, we are also carrying out a robust advocacy campaign targeting the RMG workers and their employers in Gazipur to raise awareness of personal and occupational health and safety measures against COVID-19.

We have been working with different stakeholders including the Ministry of Labour & Employment (MoLE) and the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) on a national level to find solutions and foster sustainable improvements in the garment industry. We are delighted to partner with DIFE to observe the World Day for Safety and Health at Work this year to further reinforce our collective efforts for improving OSH in Bangladesh's ready-made garment (RMG) sector.

In line with the ILO's slogan for this year's World Day for Safety and Health at Work, our efforts continue to focus on leveraging the elements of an OSH system as set out in the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187).

On this day, let us reflect on the progress made in Occupational Safety and Health Management in Bangladesh's RMG sector over the years and adjust priorities to ensure a safer workplace for all women and men working in this sector.

Embassy of Denmark: contribution to improvement of OSH in Bangladesh

Søren Asbjørn Albertsen
Sector Counsellor
Royal Danish Embassy

The Embassy of Denmark believes in safe, healthy and harmonious workplaces as a key to a stable Labour Market, which again is the foundation for stability and economic growth.

Related to DIFE (Department for Inspection of factories and Establishments), the flagship project is “Improving the Health and Safety of Workers in Bangladesh through the Strengthening of Labour Authorities” (Strategic Sector Corporation, SSC).

The SSC project is funded by DANIDA. It is a Government to Government cooperation between the Ministry of Labour in Bangladesh & the Ministry of Employment in Denmark. Implementation is handled by DWEA (the Danish Labour Inspection) in close cooperation with the Danish Embassy and DIFE. Main focus is capacity building of DIFE.

One of the key strengths of the SSC project is that the core concept is cooperation between staff in similar organisations (the National Labour Inspection). The effect of this common ground and common work sphere creates a good starting point for learning.

The turning point is the education of “Master trainers” within 7 different topics. Many activities have been initiated thanks to these master trainers: DIFE2DIFE training (training of peers), National Guidelines on Labour Inspection, Targeted Inspections, Advise how to anchor knowledge in DIFE and as a side effect: long (2 year master) or short trainings (OSH, Management, High level exposure) in Denmark.

During 2020 Covid-19 has been the unexpected occurrence that for some months swept all other challenges of the labour market aside. Donors - incl. SSC - have all contributed to a safe return to work, when the work places opened after the lock down. The SSC project has donated masks and gloves to the DIFE district offices.

Brush up courses for Master Trainers and other trainings have been accomplished during COVID 19, but all parties are looking forward to a normalization of things and return to more efficient and personal training.

Overall, the SSC supports MoLE's (EU /ILO) roadmap related to the "GSP+" negotiation - this also goes for the DIFE Roadmap - originally developed in cooperation with ILO.

Apart from the SSC project Denmark is supporting "Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations", SDIR, that is being implemented by ILO. It aims at creating tools, institutions and understanding that supports negotiation as a means of conflict resolution and it builds on the tripartite system that enables the three parties: employers organisations - unions and government to maintain a constructive social dialogue to find common solutions in a win-win-win scenario.

The three main objectives of SDIR are: 1. Improved social dialogue and grievance handling, 2. Mechanisms for conciliation and arbitration and 3. Organisational capacity to prevent and resolve disputes.

The project "Network to Integrate Productivity and Occupational Safety and Health improvements" (NIPOSH) is implemented jointly by AUST and BGMEA with University of Southern Denmark as an external consultant. It covers:

Recruitment and selection of 20-30 RMG factories for a network. These factorise are then being instructed and frequently guided to introduce LEAN management with a strong OSH component in their production. In 2022 results in terms of both productivity and Osh improvements will be measured and communicated. As a side effect BGMEA staff is following the process in order to be able to take over some or all of this kind of activity from 2022. The project builds on convincing research results 2015-2020 by AUST and SDU.

On top of the above mentioned projects, Denmark is also supporting two research studies on audits and inspections in factories a. what works and what does not - and why and b. overall impact of audits/inspections.

The Danish Embassy's cooperation with MoLE/ DIFE is being coordinating with likeminded partners from donors and international organisations. This has recently resulted in frequent coordination meetings in a formal set up led by MoLE

Health and Safety in Workplace

Mohammad Abbas Uddin (Shiyak), PhD, CText FTI
Assistant Professor and Head
Department of Dyes and Chemical Engineering
Bangladesh University of Textiles

Workplace safety is about preventing injury and illness of employees and visitors in a workplace. Ensuring a safe workplace is important for moral, legal and financial reasons. According to an International Labour Organisation (ILO) estimates, approximately 2.3 million workers die every year from work—related injuries and diseases. An additional 160 million workers suffer from non-fatal work-related diseases and 313 million from non-fatal injuries per year. The economic cost is more—than 4 per-cent of the world's annual GDP is lost as a consequence of work-related injuries and diseases.[1] Thus A safe and healthy work environment is essential for business success as it creates a positive image to its stakeholders, increases job satisfaction and reduces healthcare costs.

In this article, we will look around the major concept of health and safety in the workplace.

1.1 Space

Space is one critical issue for every-day movement and work. Every room where people work should have sufficient floor area, height and unoccupied space for purposes of health and safety.

1 https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/osh/lang--en/index.htm

1.2 Personal risk assessment

Risk assessments should be conducted for each task that may have a level of risk. Generally, managers are responsible for assessing workplace risk. The hazards and risks must be explained to everyone working in the factory. Risk assessment should be conducted every month/once in every three months (Bangladesh Labour Rules 2015, Schedule 4 (4)).

There is a five-step process to follow

- Identify the Hazards and the Risk
- Decide who could be harmed
- Establish control measures
- Record findings and inform people who may be harmed; employee awareness program, training etc.
- Review regularly or after an incident

1.3 Slips, trips and falls

Slips happen when there is not enough friction between feet and the surface of the walk. Common causes of slips include wet or oily floors, spills, loose or unchored mats, and flooring that lacks traction. (e.g. polished tiles).

Trips happen when anyone's foot strikes an object or bumpy and causes imbalance. Workers trip due to a variety of reasons; such as uneven flooring, poor lighting, trailing cables, wrinkled carpeting or rugs.

1.4 Personal protective equipment (PPE)

PPE helps to protect users against health or safety risks in the workplace. It includes items such as safety helmets, gloves, mask, face shield, respirator, high-visibility clothing, safety footwear and safety harnesses.

PPE is the last line of defense against residual hazards after all practical measures have been taken to remove or reduce them.

1.5 Chemical safety

Chemicals with the potential to cause harm are termed **Hazardous Chemicals** or **Dangerous Chemicals.** A person who is responsible for chemicals and also managers in the store will determine which hazardous chemicals are present in the workplace. The risks from exposure to these chemicals need to be assessed and controls should be put in place to limit exposure to hazardous chemicals.

1.6 Electrical safety

Many accidents at work involving electric shock or burns happen in Bangladesh. **Electric shocks** can result in death, known as electrocution. The sudden muscular contraction during the shock can result in injuries from, for example, falling. Electric current flowing through the body can cause deep burns.

Arcing and overheating can cause fire or explosion by igniting flammable materials. This can cause death, injury and considerable financial loss.

The risk of electric shock is greater in areas that are wet or damp.

1.7 Occupational noise exposure

Noise at the workplace can cause hearing damage that is temporary or permanent. This can be hearing loss that is gradual because of exposure to noise over time, such as in Generator. Also, damage can have caused by sudden, extremely loud noises. According to Bangladesh Noise pollution (Control & Regulation) rule 2000 (3(1) & 4(1)), noise level should not exceed 75 dB (A) Leq. (daytime) and 70 dB (A) Leq. at night time in any industrial area.

1.8 Working at height

Falls from height are responsible for many serious and fatal injuries. Falls above 2 meters are likely to lead to serious injury. Activities that involve working at height include ladders, scaffolds and platforms, roof work, working over tanks and pits, or on top of vehicles or trailers.

1.9 Emergency preparedness

Knowing what to do in case of an emergency is essential in any place of work. The manager must ensure that emergency preparedness plans are in place and—adequate. Emergencies could be due to medical, fire, chemical or natural disaster. Proper training and mock drills should be carried out on regular basis.

1.10 Machinery safety

There are many different types of machines and equipment used in a factory. They can range from the smaller hand held equipment such as power tools to washing machines, dryers, straightener. All of these machines are potentially dangerous and have caused many accidents in workplaces.

Acknowledgement: Phil Proctor, RCB
Photo courtesy: Reed Consultancy, Bangladesh customercare@reedconsultingbd.org

Conclusion

It is expected that the workplace has to be safe for the most important part of the workplace – Employee. A safe employee is a happy employee, and it is a collective responsibility to make the workplace better.

নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রত্যেক শ্রমিকের আইনগত অধিকার

আলমগীর শামসুল আলামিন
প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব

কোন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হলো দক্ষ জনবল। আর উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সুস্থ শ্রমিক। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা সুবিধা প্রতিটি শ্রমিক-কর্মচারীর আইনগত অধিকার। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মালিকের নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য হলো শ্রমিকদের একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ প্রদান করা এবং তার অনুশীলন নিশ্চিত করা।

শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে সরকার। আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাপকাঠিতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। এদেশের অধিকাংশ নাগরিকের জীবন-জীবিকার মানের পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশ আজ অবকাঠামোগত দিক দিয়েও সমৃদ্ধির পথে। আর অবকাঠামোগত সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের সাথে বড় সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে আবাসন শিল্পের একমাত্র প্রতিষ্ঠান রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)। এছাড়া সরকারের রাজস্ব আয়, কর্মসংস্থান, বিভিন্ন প্রকার লিংকেজ শিল্প প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র নির্মাণ খাত জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ১৫ শতাংশ অবদান রেখে আসছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা আমাদের দেশের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত করতে সক্ষম হইনি। এ ক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক উভয়ের দায় রয়েছে। নিরাপত্তা উপকরণ ব্যবহারে শ্রমিকদের রয়েছে উদাসীনতা। আর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের রয়েছে যথাযথ মনিটরিং এর অভাব।

আমাদের আবাসন শিল্পে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণের কথা বিবেচনা করে আমরা রিহ্যাব এর পক্ষ থেকে একটি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। সেখানে এই সেক্টরের শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আর সবার আগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নিরাপত্তা বিষয়ে।

সারা বিশ্ব এখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে ব্যাপক মানুষের প্রাণহানী হচ্ছে। থমকে গেছে অর্থনীতি। বাংলাদেশের প্রায় ৯০% মানুষ কাজ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। মোট জনসংখ্যার প্রায় পনেরো শতাংশ মানুষের মাথাপিছু দৈনিক গড় আয় ৫০০ টাকার কম। করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধকল্পে সরকার লকডাউনের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ তাদের পরিবার চালাতে দৈনিক মজুরির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে আরও বিপর্যয় বয়ে আসার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দীর্ঘমেয়াদী লকডাউন বজায় থাকলে কর্মহীনতা ও দারিদ্রতা লাগামহীন হারে বাড়তে পারে, এর সাথে বাড়তে পারে অনাহারজনিত মৃত্যুর সংখ্যাও। অর্থনীতিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে হলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

এ করোনা ভাইরাসজনিত মহামারীকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কিভাবে অর্থনীতির চাকা সচল রাখা যায়? বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কি ধরণের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত? এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারে সরকার।

করোনা ভাইরাসজনিত মহামারী থেকে রক্ষা পেতে হলে কর্মক্ষেত্রে সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থবিধি মেনে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সকল শ্রমিকের জন্য পর্যাপ্ত পানি, সাবান ও সাধারণ স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা, জীবাণুনাশক সরবরাহ করা এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। আমি বিশ্বাস করি, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ সংকট কাটিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। সচল থাকবে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিগত সময়ের ন্যায় এবারও পালিত হতে যাচ্ছে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস-২০২১ সফল হোক। রিয়েল এস্টেট এ্যান্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

Importance of comprehensive Occupational Health and Safety Management System in Ready-Made Garments Sector in Bangladesh

Mohammad Firoz Alam
Senior Technical Advisor
Employment Injury Protection Scheme (EIPS) Project
GIZ

When we talk about prevention on Occupation Health and Safety (OHS), our key guiding document is Bangladesh Labour Act 2006, and there are specific chapters and clauses on OHS. Bangladesh Government has taken huge initiatives after Rana Plaza tragedy in 2013 which includes developing national tripartite plan of action on fire safety and structural integrity, amendment of Bangladesh Labour Act in 2013 and subsequently the Labour Rules in 2015, formation of Accord and Alliance as part of buyers and brands initiatives, initiatives from the associations BGMEA, BKMEA, Employers Federation and so on. Formation of safety committee is every factory is one of the significant achievements including electrical, fire and building safety by the Accord and Alliance. All roads pointed to the same destination to ensure safer and healthy workplace for workers through preventing workplace incidents.

However, despite the obligations, when we see the implementation of OHS intervention at factory, it is somehow fragmented and there are ample of opportunities to make the intervention more comprehensive through avoiding fragmentation of delivering interventions. Sustainability of any activities is crucial now a days and from this perspective, the continual improvement concept is essentially needed.

Continual Improvement can be defined as never ending process as the complexity of processes of any industries is unique and it is not static rather it is more dynamic and hence the Plan, Do, Check, Act concept needs to be continued as to make any initiative sustainable.

The critical question remains, have all the improvements in the infrastructure, utility, and detection/ protection systems represented the best performance level of OHS Management System, ensuring protection of workers in the RMG and Textile factories? Implementing comprehensive OHS management system could be the best solution for the industry and followings are the key ingredients could be considered.

Ref: William Edwards Deming

Top Management Commitment:

At the factory level, prioritization of assignments largely depends upon the approval of the Top Management. Therefore, level of commitment to effective implementation of OSH Management System from the factory level Top Management remains vital and the starting point of sustainability of OSH Management System.

The 3 elements that take priority at factory level are – production, deadline, and profitability. OSH management priorities get pushed back if there is a conflict between the 3 KPIs of factory performance and the imperatives of good OSH Management.

This needs to be overcome substantially with high motivation and commitment of the top management so that when there is a conflict arises between production priorities and OSH priorities, the later should prevail.

Just a single announcement of top management can create big differences as the positive intention of top management having trickle down effects amongst the rest of the workforces. To make the OHS interventions sustainable, the top management have numerous roles to play which includes resources allocation including human resources, financial resources, and other logistics. At the same time, determining roles, responsibilities and authorities are key responsibilities of top management.

Continuation of Risk Assessment:

Risk Assessment is heart of OHS Management System, following the steps starts from 1. Identifying hazard 2. Determining the risk associated with identified hazard 3. Assessing the Probability and Severity 4. Evaluating risk level (combination of probability and severity) 5. Finally determining the controlling measures. The whole process of risk assessment gives the opportunities of consultation and participation of workers which really foster the ownership of workers towards the development of OHS implementation. Once health and safety condition of an establishment is identified, then question comes, how should it be controlled, and to control the identified risks, hierarchy of control measured to be followed.

Conducting risk assessment is one of the key responsibilities of Safety Committee and hence the members of safety committee must be trained on how to conduct risk assessment and follow up the implementation of determined control measures. At the same time, risk assessment is the most important activities for any establishment with regards to maintaining health and safety activities.

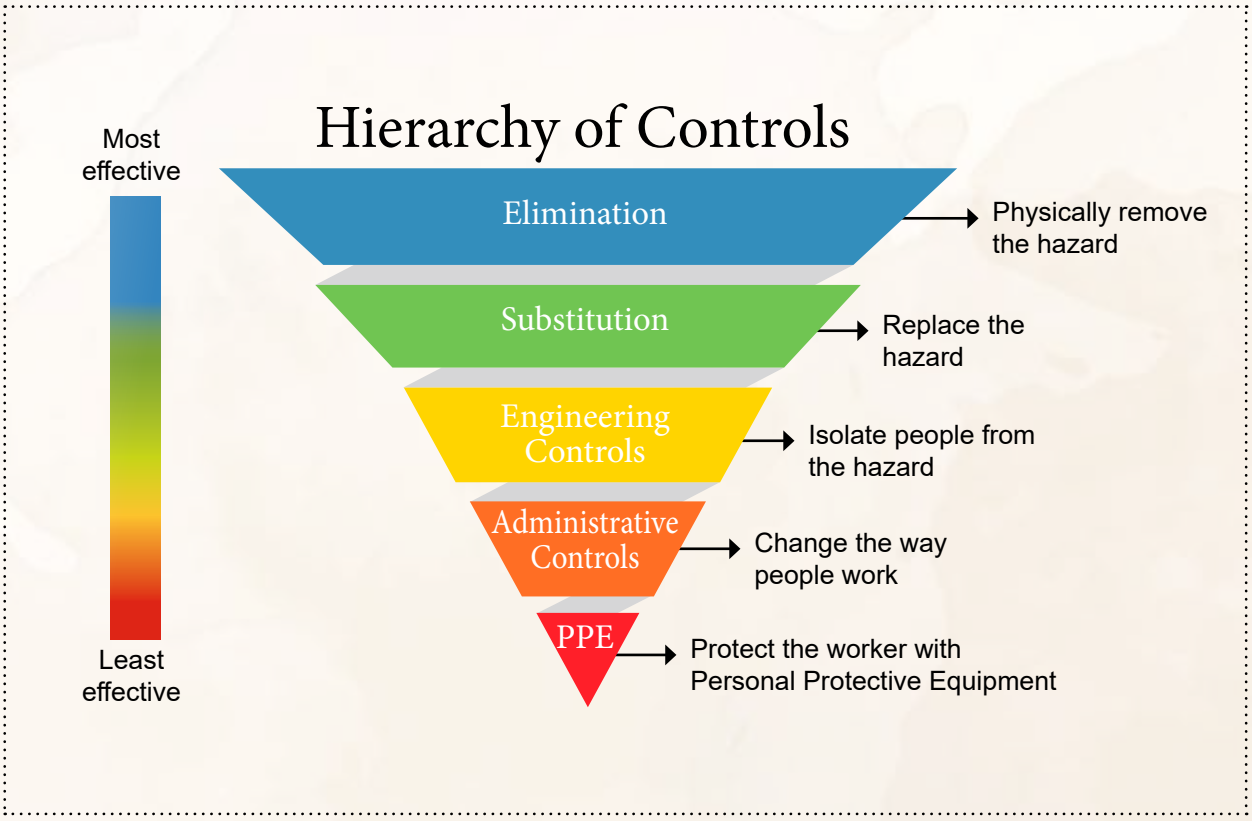

Ref: NIOSH's Hierarchy of Controls infographic

Now a days, most of the Buyers and Brands have incorporated the necessity of conducting risk assessment on OHS into their Code of Conduct (CoC). Maintaining risk assessment at workplace, fulfilling the legal requirements and at the same time other requirements which related to buyer's CoC and requirements of their associations.

Functional Safety Committee:

Bangladesh Labour Rules 2015 has outlined the role of a Safety Committee in elaboration. If we look closely at the Schedule 4 of Bangladesh Labour Rule 2015, we will find that the safety committee has been made the Focal Point of all safety related processes in the factory including risk assessment on OHS. However, there are plenty of scope to make the safety committee more functional though building capacity of members and engaging them as per their responsibilities stipulates in the Bangladesh Labour Rules 2015.

Provision of Safety Officer: There is no legal requirement so far, to have a Safety Officer in the factory. However, this position is a critical one. A well-qualified, competent Safety Officer can play a great role in ensuring effectiveness of OSH Management in the factories. The existing Fire Safety Officer is not the safety officer that will have a major role in sustaining the OSH Management System in the factories. To foster the knowledge on safety and health at work, a competent national institute should be established to supply the industries with personnel with proper qualification.

Competence of Fire Safety Officer:

Fire has caused the largest number of casualties in the RMG factories of Bangladesh and in the future, fire and explosion will remain the number 1 cause of casualties in the RMG industries of Bangladesh. Therefore, the competency of Fire Safety Officer, in whose hand lie the availability and reliability of the entire Fire Safety System, needs to be more competent than what they are.

Role of Doctors and Medical Team:

Doctors can play a very good role in the factory for making OSH Management sustainable in the RMG and Leather Industry. They are directly involved with the OSH performance of the factory, by way of attending patient with injury or with health complaints. They have good insight in the health hazards (biological, chemical, ergonomic etc.) as well as they receive the initial information of any injury or ill-health. They can diagnose the root causes of injury and ill-health and provide prudent inputs for prevention of such accidents. Therefore, they should be brought out of the present confined role of attending patients and issuing medicine and given bigger responsibilities.

Incident Recording and Reporting:

As part of legal requirements every company must record their incidents and report to the Department of Inspection for Factories and Establishment (DIFE) in a regular interval and as part of effective OHS management system, it is recommended to have regular practice of recording incidents. Based on the prevalence of incidents, management needs to implement programs and activities and check the effectiveness of implemented programs, and if it works, then it should be maintained as regular intervention.

Establishing Internal Auditing System:

As part of continual improvement of OHS activities, every establishment must establish the internal auditing system with competent internal auditor. The internal auditing team can make internal audit program in advance for a particular year. While developing the internal audit program, the team can follow the risk-based approach, meaning the process having more risk, will be given proportionately more frequent audits.

Concluding Remark:

The above points are identified during implementation of OHS intervention at the ready-made garments and textile section in Bangladesh, however these are not the exhaustive list of activities, however, the implementation fully depends on the innovation, creativity, and style of management.

Effective implementation of OHS Management system can bring positive changes of any companies and the benefit comprised of declining of medical costs, reduce compensation for injury resulting partial or permanent disability. It can reduce property damage and reduce cost of emergency services. Most importantly it gives the confidence that, the legal requirements are fulfilled and creating OHS culture and eventually the organization implementing effective OHS management system can create brand image and goodwill.

করোনাকালীন সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব

মামুন অর রশিদ
তথ্য কর্মকর্তা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলছে কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব, যার ঢেউ এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশেও। প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন-জীবিকা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিল্প-উৎপাদন, অর্থনীতিসহ সকল কিছুর ওপর। এর ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ। সামগ্রিক শ্রমবাজার সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অনেকাংশেই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কারখানা বন্ধ হচ্ছে, শ্রমিক চাকুরি হারাচ্ছে, বাসস্থান থেকে বিতাড়িত হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে কারখানায় উৎপাদন ব্যবস্থা চলমান থাকলেও শ্রমিকের যথাযথ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি, কর্মহীন অবস্থায় রয়েছে অনেক প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে আসছে। ফলে এই সকল স্বল্প আয়ের মানুষের জীবন কাটছে চরম ঝুঁকিতে ও অনিশ্চয়তায়। একই সাথে ঝুঁকিতে রয়েছে কোভিড-১৯ এর সম্মুখ যোদ্ধা স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার, নার্স, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং জরুরি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দরাও।

মারাত্মক সংক্রমণ ঝুঁকির মধ্যেও বর্তমানে জরুরি সেবা ও চাহিদা পূরণে তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক, চা শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, ময়লা ও বর্জ্য নিষ্কাশনকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্বাস্থ্যকর্মী, ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাতে নিয়োজিত কর্মীসহ কয়েক মিলিয়ন শ্রমিক ও কর্মচারীকে কাজ করতে হচ্ছে। এছাড়াও জরুরি সেবা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে খাদ্য সরবরাহ ও উৎপাদনে নিয়োজিত কর্মীগণ, মুদি ও কাঁচামাল সরবরাহকারীগণ, বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীগণ এ মুহূর্তে অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যেও তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের অনেকেরই কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে বা কর্মস্থলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে। করোনা সংক্রমণকালীন সময়ে তাই বিশাল এ জনগোষ্ঠীর পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যদিকে কোভিড-১৯ এর কারণে লাখ লাখ মানুষের নতুনভাবে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিককে দরিদ্র্য হিসেবে বিবেচনা না করায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা ও সুরক্ষা প্যাকেজ থেকে তারা বঞ্চিত। এছাড়া অতি সম্প্রতি সরকার ঘোষিত বাজেটে শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন এবং জীবিকার সুরক্ষায় গৃহীত কর্মসূচিসমূহে বরাদ্দ সন্তোষজনক নয়। এ পরিস্থিতিতে সামনের দিনগুলোতে শ্রমজীবী মানুষ আরও গভীরভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক সংকটে পড়তে যাচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, শ্রমজীবী মানুষ, সম্মুখ যোদ্ধা ও সেবা প্রদানকারীদের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের করণীয় নির্ধারণ করা এখন সময়ের দাবী।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। করোনার নতুন পরিপ্রেক্ষিত, নতুন অবস্থার মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের কাজ করতে হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় কাজ করছে। অনেকেই সরকারের নির্দেশ মোতাবেক বাড়ি থেকে কাজ করছেন কিন্তু বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের যে কাজ সে কাজ ভার্চুয়ালি করা সম্ভব হয় না। আর সে কাজ করতে গিয়ে অনেকে বাইরে যাচ্ছেন। যারা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ এবং প্রত্যক্ষ সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তি আছেন যাদের কোন প্রকারের পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না তারাই আক্রান্তের শিকার হয়েছেন।

বিলস প্রত্যক্ষভাবে কোভিড-১৯ এর শুরু থেকেই সহযোগিতা করার পাশাপাশি পরোক্ষভাবেও সহযোগিতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে চট্টগ্রামে বিলস এর উদ্যোগে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মেলার আয়োজন করা হয়। ২০২০ সালে আয়োজিত মেলায় ১৮টি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহ স্ব স্ব স্টলে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর নানা উপকরণ এবং প্রকাশনা প্রদর্শন এবং বিতরণ করে। মেলা থেকে শ্রমিকরা তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতামূলক দিক নির্দেশনাসহ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার বিভিন্ন কৌশল সচিত্র জেনে থাকেন। এছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে সম্যক ধারণা পেয়ে থাকেন।

করোনাকালীন সময়ে বিলস এর উদ্যোগে "কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শ্রমিক, সম্মুখযোদ্ধা ও সেবা প্রদানকারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা" বিষয়ক একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করে। সেখানে সরকারি, বেসরকারি, নাগরিক সমাজ, ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিরা কোভিড-১৯ মহামারী সময়ে শ্রমিক, সম্মুখযোদ্ধা ও জরুরি সেবা প্রদানকারীদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি পর্যালোচনা করে তাতে মহামারী পরিস্থিতিতে শ্রমিক ও কর্মক্ষেত্রের জন্য করণীয় বিষয়গুলো পুণর্বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ সংযোজনের আলোকে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিলস এর সংবাদপত্র জরিপ অনুযায়ী ২০১৫ থেকে ২০২০ এ ছয় বছরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা ৮ হাজার ৮ জন শ্রমিক। এর মধ্যে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ৪ হাজার ৭৯৫, আহত ৩ হাজার ২১৩ জন। শুধুমাত্র ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭২৯ শ্রমিক নিহত এবং ৪৩৩ জন আহত হয়েছেন। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ৩৪৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহন খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে।

শ্রমিকরা তাদের জীবিকার জন্য কাজে যায়। তাদের কর্মস্থলের নিরাপত্তা এবং কোভিড-১৯ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সচেতনতা প্রয়োজন। সরকার শ্রমিকদের জীবিকার জন্য এবং অর্থনীতি সচল রাখতে সব শিল্প কারখানা খুলে দিয়েছে। তাদের জন্য স্বাস্থ্য পলিসিও করেছে কিন্তু যাদের কর্মচারী তাদের জন্য কি করবে কি ব্যবস্থা নিবে সে ব্যবস্থা কি মালিকপক্ষ নিয়েছে কিনা এবং ফ্যাক্টরি আইনের ক্ষেত্রে কিভাবে তা কাজ করবে সেটা বিবেচ্য বিষয়।

যদি কোন শ্রমিকের কোভিড-১৯ পজিটিভ হয় তাহলে তাকে আইসোলেশনে কোথায় পাঠাবে, এটা কি ফ্যাক্টরি দায়িত্ব নিবে নাকি সরকারি যে ব্যবস্থাপনা আছে সেখানে যাবে এ বিষয়গুলো ঠিক করা প্রয়োজন। এছাড়াও শ্রমিকের পরিবারের দেখাশোনার বিষয়টিও উঠে আসে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যেভাবে বীমার আওতায় আনা হয়েছে, সেভাবে শ্রমিকদেরও বীমা নিশ্চিত করা যায় কিনা তা সকল পক্ষকে বিবেচনা করতে হবে।

শ্রমিক শুধু এক শ্রেণীর নয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক মিলে বিভিন্ন ধরণের শ্রমিক রয়েছেন। অনেক শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। তারা গ্রামে চলে গেছেন, শ্রমিকরা এখন মুদির দোকানি করছে, ঠিকাদারি কাজ শুরু করেছে। শ্রমজীবী মানুষেরও ভালোভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে তাদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সচেতনা বৃদ্ধিমূলক প্রচারনা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আইন আছে। তবে মালিক, শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করা না গেলে কেবল আইন দিয়ে কিছু হবে না। আইন আছে, নীতি আছে কিন্তু বাস্তবায়ন নেই। শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আইনের সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে কারখানার নিরাপত্তা কমিটিকে শক্তিশালী করা গেলে অনেকটা সুফল পাওয়া সম্ভব।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যয় যে কোনো খরচ নয়, বরং বিনিয়োগ- এটি বাংলাদেশের শিল্প কারখানা মালিকদের এ উপলব্দি করতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে স্থায়ী-অস্থায়ী ও ছোট-বড় মিলে প্রায় ৮০ লাখের মতো বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে সব প্রতিষ্ঠান শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নজরদারিতে নেই। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি খাতে পরিদর্শন ব্যবস্থা শুরু করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। যেসব প্রতিষ্ঠানে ডিআইএফই-এর নজরদারি নেই, সেখানকার শ্রমিকেরা অনেক সময় ঝুঁকির মধ্যেই পেশাগত দায়িত্ব পালন করছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা রোধে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহারে সচেতনতা বাড়াতে হবে। দুর্ঘটনাগুলোর কারণ বের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সরকার এবং বিভিন্ন অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়, ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক, এনজিও সর্বোপরি সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। তাহলেই সকলের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

করোনা পরিস্থিতি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

করোনা মহামারী স্বত্ত্বেও বিগত ২০২০ সালে ৩৭৩ টি কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৪৩৩ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। করোনা ভাইরাসে প্রথম দিকে মৃত্যু ও সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় গত বছর ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল এবং সংক্রমণ না কমায় সাত দফায় ছুটি বাড়িয়ে টানা ৬৬ দিন বন্ধের পর ১৩ জুন খোলা হয়েছিল দেশের সব সরকারি-বেসরকারি অফিস, পুঁজিবাজারসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই সময় শ্রমিকদের কোনো কাজ না থাকায় তারা অপরিসীম দুর্ভোগে দিনাতিপাত করেছেন। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনোমিক মডেলিং (সানেম) এর গবেষণা অনুযায়ী প্রায় ৬ মিলিয়ন ব্যক্তি কাজ হারিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পাশাপাশি করোনা থেকে সুরক্ষাও এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সাথে সাথে করোনা সুরক্ষাও শ্রমজীবি মানুষের অধিকার।

করোনাকালে বিভিন্ন খাত

পোশাক খাত

পোশাক শিল্পে করোনা শুরু থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্তহীনতা লক্ষ্য করা গেছে। কারখানা বন্ধ এবং খোলা বিষয়ে শ্রমিকরা ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। শ্রমিক ছাঁটাই এবং বিভিন্ন ছোট ছোট কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। শ্রম বিষয়ক গণমাধ্যম (শ্রমিক আওয়াজ) সূত্র দাবী করেছে, ২০২০ এর জুলাই এ ১৯৩ টি কারখানায় প্রায় সাড়ে চারশত শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। যার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে ৬ জন। বাংলাদেশ ইন্সস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) ২৭ আগষ্ট এক সংবাদ সম্মেলনে জানায়, মহামারীকালে বিভিন্ন সময়ে পোশাক খাতে প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়েছে এবং লে-অফ হয়েছে প্রায় দুই হাজার কারখানা।

ট্যানারি

ঢাকার হাজারিবাগ থেকে সাভারে ট্যানারি স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে ছাঁটাই চলছিল। করোনা ভাইরাস তাতে নতুনভাবে যোগ হয়েছে। চামড়া শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিমুখী খাত। করোনাকালে প্রায় ৩ থেকে ৪ শত শ্রমিক কাজ হারিয়েছে।

নির্মাণ

নির্মাণ খাতের শ্রমিকরা করোনাকালীন সময়ে সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। সরকার ঘোষিত লকডাউনে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড়বড় শহরগুলোতে নির্মাণ কাজ বন্ধ ছিল। এই সময়ে তারা অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন, ঋণ, দোকান থেকে বাকী করেছেন এবং বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন নি। বেশিরভাগ শ্রমিক শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সেখানেও এলাকাবাসীর বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন। শহর থেকে গ্রামে করোনা ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে তাদেরকে গ্রামে ঢুকতে বাঁধা দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের রক্ষায় সরকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করলেও নির্মাণ খাত সেই সুবিধা পায়নি। লকডাউন পরবর্তীতে কম পরিসরে কাজ শুরু হলেও মজুরী কম ও কাজের স্বল্পতা রয়েছে। (সূত্র: দৈনিক সমকাল, ৭ মার্চ ২০২১)।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রতিটি শ্রমিকের অধিকার। ২০০৯ সাল থেকে সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস) দেশের কর্ম-পরিবেশের মান উন্নয়নে এবং শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসহ শ্রমক্ষেত্রের অন্যান্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে। প্রতিবছর কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বিগত ২০২০ সালের কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৭৭ জন; বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৯৬ জন; ছাদ, মাঁচা ও উপর থেকে পড়ে ৪৫ জন; শক্ত বা ভারী কিছুর আঘাতে ৩৬ জন; ব্রিজ, ভবন, ছাদ, মাটি ও দেয়াল ধ্বসে ১৯ জন; আগুনে পুড়ে ১৮ জন; বজ্রপাতে ১১ জন; বিভিন্ন বিস্ফোরণে ১২ জন ; বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ১০ জন; পানিতে ডুবে ৯ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন এবং তাদের পরিবার হারিয়েছে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে।

সেক্টর	বয়লার, সিলিন্ডার এবং অন্যান্য বিস্ফোরণ	ভবন, ছাদ ও দেয়াল ধস	শক্ত বা ভারী কিছুর আঘাত	পানিতে ডুবে	মাটি ও পাহাড় ধস	বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে	উচুস্থান/ গাছ/ট্রা-ক থেকে পড়ে	আগুনে পুড়ে	বজ্রপাতে	সড়ক দুর্ঘটনা	বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে	মোট
কৃষি						৫			১১			১৬
নির্মাণ		৮	১১			৫০	৩৫			৪	১০	১১৮
উৎপাদন	৬	১	১৪		১	৭	৪	১২				৪৫
সেবা	৬		১১	৯	৯	৩৪	৬	৬		৫		৮৬
পরিবহন										১৬৮		১৬৮
সর্বমোট	**১২**	**৯**	**৩৬**	**৯**	**১০**	**৯৬**	**৪৫**	**১৮**	**১১**	**১৭৭**		**৪৩৩**

সেক্টরভিত্তিক কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ ২০২০

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনার তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, সব থেকে বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছে পরিবহন খাতে যার সংখ্যা মোট ১৬৮ জন, এর পরই রয়েছে নির্মাণ খাত এই খাতে নিহত ১১৮ জন, সেবা খাতে যেমন- ওয়ার্কশপ, গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) ৮৬ জন, কল-কারখানা ও অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানে ৪৫ জন এবং কৃষি খাতে এই সংখ্যা ১৬ জন।

বিগত পাঁচ বছরের কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নরূপ:

বছর	নিহত শ্রমিকের সংখ্যা
২০১৬	৩৮২
২০১৭	৪৩৭
২০১৮	৫৯৩
২০১৯	৫৭২
২০২০	৪৩৩

উপরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা কমেনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা মহামারী সত্ত্বেও ২০২০ সালে এর পরিমাণ ৪৩৩ জন। পরিবহন খাত এবং নির্মাণ খাতে নিহতের সংখ্যা অধিক।

সংবাদপত্রের ভিত্তিতে জরিপ পরিচালনা করে প্রতি বছর সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় প্রতি বছর শ্রমিক নিহত হয় এবং সেই সাথে তার পরিবার হারায় সংসার চালানোর একমাত্র ব্যক্তিকে। অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন ব্যবস্থা, নির্মাণ কাজে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর অপ্রতুলতা, আইন প্রয়োগে বাঁধা ইত্যাদি কারণে দুর্ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। তাছাড়া যত্রতত্র কল-কারখানা গড়ে উঠায় দুর্ঘটনায় শুধু শ্রমিক নয় সাধারণ জনগণও আক্রান্ত হচ্ছে। এসব দুর্ঘটনা প্রতিহত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নজরদারী বাড়াতে হবে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। অধিকাংশ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটে নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার না করে বিদ্যুতের লাইনে সংযোগ দেয়ার সময়, মটর চালু করতে গিয়ে, মাথার উপর বয়ে যাওয়া বিদ্যুতের লাইনের নিচে কাজ করতে গিয়ে বা নির্মাণ সাইটে লোহার রড নিয়ে কাজ করার সময় শক্তিশালী বিদ্যুতের লাইনে লোহার রড স্পর্শ করার ফলে।

ছাদ, মাঁচা ও উপর থেকে পড়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার না করা উল্লেখযোগ্য। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অতীব জরুরি। করোনার কারণে দীর্ঘ সময় শ্রমজীবীরা কোনো কাজে যুক্ত ছিল না, সবকিছুর ক্ষেত্রে এক ধরনের অচল অবস্থা বিরাজ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্ম-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেনি।

করোনাকালে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

করোনাকালে শ্রমজীবীর করোনা সুরক্ষা যেমন জরুরি তেমনি পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাও জরুরি। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে শ্রমজীবীর কোনো বিকল্প নেই। সেই শ্রমজীবীর জীবন মান উন্নয়নে যে কোনো ব্যয়কে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে বাজেট বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।কল-কারখানায় শ্রমজীবীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। করোনাকালকে মাথায় রেখে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। কর্মস্থল স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিচ্ছন্ন রাখা; নির্মল বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলো ও আরামদায়ক তাপমাত্রা থাকা; প্রত্যেক শ্রমিকের মাঝে ১.৫ মিটার দুরত্ব রাখা; বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা রাখা; অতিরিক্ত গরম পরিবেশে কর্মকালীন সময়ে খাওয়ার স্যালাইনের সুবিধা রাখা; নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিরাপদ ভবন, যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, অগ্নি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে নিরাপদে বের হওয়ার ব্যবস্থা; বিকল্প সিঁড়ি, প্রতিবন্ধকতামুক্ত চলাচলের পথ, উন্মুক্ত গেইট/দরজা এবং আগুন নেভানোর সরঞ্জাম রাখা; অগ্নিকান্ডকালে করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও মহড়ার ব্যবস্থা করা; দৈনিক নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা; সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা; বিপজ্জনক চালনা ও রাসায়নিক ব্যবহারে সম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক নির্দেশিকা কাজের স্থানে বাংলায় পরিষ্কারভাবে প্রদর্শন করা।

কাজ করাকালীন অবস্থায় কোনো শ্রমিক আহত বা নিহত হলে মালিক সেই শ্রমিক বা তার পোষ্যকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। মালিকের অবহেলার কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দ্বিগুন হবে।

করোনা সুরক্ষা নিশ্চিতে কাজের স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাস্ক রাখা নিশ্চিত করতে হবে। এই ভাইরাস থেকে শ্রমজীবীদের রক্ষা করতে চোখে পড়ে এমন স্থানে এবং কাজের প্রতিটি ফ্লোরে বাংলায় নির্দেশনা টাঙিয়ে রাখতে হবে।

করোনাকালীন সময়ে এসআরএস'র গৃহীত পদক্ষেপ ও চলমান কার্যক্রম

এসআএরএস কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মান উন্নয়ন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ আদায়ে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা, এ্যাডভোকেসি, মানবিক সহায়তা এবং অনুরূপ ধরনের সেবার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। পোশাকখাত ও নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং শ্রম আইন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। করোনাকালীন সময়ে সাধারণ ছুটি থাকলেও শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই সময়ে শ্রমিকদের কাজ না থাকায় দৈনন্দিন ব্যয় চালানো কঠিন হয়ে পরায় তাদের সহযোগিতার জন্য এসআএরএস মানবিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। সরাসরি প্রকল্পের সাথে যুক্ত ৬৪৭ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শ্রমিকদেরকে মুঠোফোনের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এসআরএস করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং বর্তমানে করছে। পোশাক খাতে কাজ হারানো শ্রমিকদের অর্থ সহায়তা প্রদান করছে। ঢাকা শহরে কর্ম হারানো ৬০০ পোশাক শ্রমিককে ৫,০০০ টাকা করে প্রদান করছে এবং ৩৬০টি পরিবারকে পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী প্রদান করছে। বিভিন্ন পোশাক কারখানায় নারী শ্রমিকদেরকে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তাছড়া বিভিন্ন পোশাক কারখানার সেইফটি কমিটি সদস্যদের কারখানার ঝুঁকি নিরুপণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

এসআরএস করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেছে। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে লিফলেট বিলি করা হয়েছে।

সুপারিশ

- কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- করোনা সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- মহামারীকালীন সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় শ্রমিকদের অন্তর্ভূক্ত করা;
- শ্রমজীবীদের জন্য আপদকালীন তহবিল গঠন করা;
- শ্রমজীবী ও পেশাজীবীদের জন্য জাতীয় সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা;
- রেশনিং এর ব্যবস্থা করা;
- চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ও আনুসঙ্গিক সুবিধা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা;
- সকল শ্রমজীবীদেরকে সাস্থ্য বীমার আওতায় আনা;
- প্রত্যেক হাসপাতালে শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সেবার সময় নির্ধারণ করা;
- করোনা আক্রান্ত শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমজীবীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত । অনেক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন আবার অনেকের মজুরী কমে গিয়েছে। শোভন কর্মপরিবেশ গড়তে সরকার বদ্ধ পরিকর। কিন্তু করোনা সংক্রমন এই গতিকে কমিয়ে দিয়েছে। তারপরও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় প্রতিবারের মতো জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের আয়োজন করছে। এসআরএস জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে করোনামুক্ত শোভন কর্মপরিবেশ গড়ার আশা ব্যক্ত করছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি চিত্র ও করণীয়

এ আর চৌধুরী রিপন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ অকুপেশনাল হেলথ সেইফটি এন্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি)

বাংলাদেশের অর্থনীতি এক সময় ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিলো। শিল্পায়নের সাথে পাল্লা দিয়ে কৃষি থেকে শিল্পে রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ক্রমশ বড় হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৮.১৫ শতাংশ। শ্রমশক্তির সিংহভাগই এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত থাকায় দেশের প্রবৃদ্ধির এ অগ্রযাত্রা শ্রমবাজারে গুণগত পরিবর্তন আনয়নে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারছে না।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) 'ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট সোশ্যাল আউটলুক ট্রেন্ডস ২০১৮' প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজার ক্রমান্বয়ে বড় হচ্ছে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারত, কম্বোডিয়া ও নেপালে প্রায় ৮৭ শতাংশ শ্রমিকই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত।

সর্বশেষ শ্রম-শক্তি জরিপেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখা গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৫.১ শতাংশই এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যা ছিলো ৮৬.২ শতাংশ। বিবিএসের শ্রম-শক্তি জরিপ অনুযায়ী, ১৯৯৯-২০০০ সালে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের হার ছিল ৭৫ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে ছিলো ৮৭.৪ শতাংশ। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৩ সালে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৮ লাখ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা বেড়ে হয়েছে ৬ কোটি ৮ লাখ ২৮ হাজার। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে পুরুষ শ্রমিকের

সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেলেও বেড়েছে নারী শ্রমিকের সংখ্যা। সর্বশেষ শ্রম-শক্তি জরিপে (২০১৬-১৭) এ খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭১ লাখ ২১ হাজারে। জরিপের খাতভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের তথ্য অনুযায়ী, কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের ৯৫ দশমিক ৪ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক। অন্যদিকে, শিল্প খাতের ১০.১ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক হলেও বাকি ৮৯.৯ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক।

বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের খাতভিত্তিক সংখ্যা :

খাত	গ্রাম			শহর			বাংলাদেশ		
	প্রাতিষ্ঠানিক	অপ্রাতিষ্ঠানিক	মোট	প্রাতিষ্ঠানিক	অপ্রাতিষ্ঠানিক	মোট	প্রাতিষ্ঠানিক	অপ্রাতিষ্ঠানিক	মোট
কৃষি	১০১৫	২১৬৮৪	২২৬৯৯	১২৯	১৮৬৪	১৯৯৪	১১৪৫	২৩৫৪৮	২৪৬৯৩
শিল্প	৭০২	৬৭৪০	৭৪৪২	৫৫৩	৪৪২৯	৪৯৮২	১২৫৬	১১১৬৮	১২৪২৪
সেবা	৩৫২৬	১০২১৮	১৩৭৪৪	৩১৬৭	৬৮০০	৯৯৬৭	৬৬৯৩	১৭০১৮	২৩৭১১
মোট	৫২৪৪	৩৮৬৪১	৪৩৮৮৫	৩৮৫০	১৩০৯৩	১৬৯৪৩	৯০৯৪	৫১৭৩৪	৬০৮২৮

সূত্র : বাংলাদেশ শ্রম শক্তি জরিপ (২০১৬-২০১৭)

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও দেশের অর্থনীতি এবং শ্রম-শক্তিতে তার প্রতিফলন নেই। শ্রম-শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩৫.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হয়েছে ৩৬.৩ শতাংশ। অধিকন্তু বিশ্বের শ্রম-শক্তির তুলনায় এ হার এখনো অনেক কম। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে শ্রম-শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ৫২ শতাংশ।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত' অর্থ 'এইরূপ বেসরকারি খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরীর শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।'

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে কৃষি, নির্মাণ, মৎস্য, চাতাল শিল্পে নিয়োজিত রয়েছেন অসংখ্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক। শ্রম-শক্তি জরিপ অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ শতাংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত। কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতে দিনমজুর ও নিয়মিত নিয়োগকৃত কর্মীর হার যথাক্রমে ১৮.১৪ শতাংশ ও ১৩.৯২ শতাংশ। বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতের হার ২১.৭৩ শতাংশ। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে চাতাল শিল্প অন্যতম। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে মোট রাইস মিলের সংখ্যা ১৬ হাজার ৩৫০টি। এগুলোর মধ্যে ৩৮১টি অটোম্যাটিক (স্বয়ংক্রিয়), ২৮৩টি সেমি-অটোরাইস মিল ও ১৫ হাজার ৬৮৬টি হাসকিং মিল (ছোট রাইস মিল)। চাতাল বা চাল কল শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। আনুমানিক হিসাবে এ সংখ্যা প্রায় চার লাখ। এর মধ্যে প্রায় ৩ লাখ নারী শ্রমিক এবং বাকি ১ লাখ পুরুষ।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত ন্যায্য মজুরি, শোভন কর্মপরিবেশ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশের প্রাতিষ্ঠানিক খাতের উল্লেখযোগ্য শ্রমিক যেখানে এখনো নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত, সেখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রাপ্তি তো কল্পনাতীত। মূল বেতন ছাড়া অন্যান্য সুবিধা একেবারে স্বল্প ও অনির্ধারিত। মজুরিতে নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রকট যা আমাদের সাংবিধানিক নির্দেশনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৪-এ বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে; কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।'

শ্রমিক-কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উৎপাদনের পূর্বশর্ত। নিয়োগপত্র, কর্মঘণ্টা, মজুরীর মতো পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে এখনো অসচেতন। ফলে প্রতিবছর এ খাতে পেশাগত দুর্ঘটনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক মারা যায়। আবার পেশাগত অসুস্থতার শিকার হয়ে অনেক শ্রমিক হতাহত হয়, যার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই।

এই হতাহতের কারণগুলোর মধ্যে নির্মাণ কাজে উপর থেকে পড়ে যাওয়া, পরিবহন দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ, ভূমি ও দেয়াল ধস, ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণজনিত বিষক্রিয়া, ভারী বস্তু উপর থেকে পড়া বা ভারী বস্তুর নীচে চাপা পড়া, ভূ-গর্ভে অনিরাপদ কাজ, বজ্রপাত, নৌকাডুবি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নারীর শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ধারা ক্রমবর্ধমান হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেই তাদের সংখ্যা বেশি । বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে তারা অস্তিত্ব রক্ষায় বাধ্য হয়ে নিজ উদ্যোগে কর্মসংস্থান বেছে নিচ্ছে । শ্রম-শক্তি জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী, দেশের শ্রমবাজারে হস্তশিল্প এবং সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৪ লাখ ৩০ হাজার ৩৪৫ জন, যার মধ্যে হোমবেইজড/গৃহ-ভিত্তিক শ্রমিক ২০ লক্ষাধিক, যারা ঘরে বসে দেশের টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকের বিভিন্ন কাজ করে থাকেন, যাদের প্রায় সবাই নারী । বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ কোটি হোমবেইজড শ্রমিক রয়েছে, যার মধ্যে ৫০ শতাংশেরই অবস্থান বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে । এদের ৮০ শতাংশই আবার নারী । শ্রমিক হিসেবে তাদের স্বীকৃতিসহ পেশাগত স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা এবং শোভন কর্মপরিবেশ উন্নয়নে মালিকপক্ষ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হয় ।

সরকার ২০১৮ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করে । মূলত গার্মেন্টস শিল্প ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে এই সংশোধনী আনা হয় । ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আইএলও-র পরামর্শে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সহজতর করা, রেজিস্ট্রেশন পেতে হয়রানি দূর করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সংশোধনীতে নমনীয়তা আনা হয় । এছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় ।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এসব উদ্যোগের সবকিছুই তৈরি পোশাক শিল্প এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কথা ভেবে করা হয়েছে । তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ-র তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করেন মোট ৪০ লাখ শ্রমিক । অন্যদিকে গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনে যুক্ত রয়েছে ২০ লাখেরও বেশি হোমবেইজড শ্রমিক, যাদের নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই ।

শুধু হোম বেইজড শ্রমিক নয়, দেশের ওয়েস্টপিকারদের অবস্থা আরও শোচনীয় । ঢাকা নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সংরক্ষণে এই শ্রমিকদের ব্যাপক অবদান থাকলেও সংশ্লিষ্ট মহলের ভাবনায় তারা অনুপস্থিত । ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুটি বর্জ্য সংরক্ষণাগারে ময়লা কুড়ানো ও সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত কয়েক হাজার ওয়েস্টপিকারের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষার দায় এড়িয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ । হকার ও গৃহ কর্মীদেরর ব্যাপারেও একই রকম হতাশার চিত্র লক্ষ্যণীয় । ওয়েস্টপিকার, হকার এবং হোমবেইজড শ্রমিকসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অন্যান্য শ্রমিকদের শ্রম আইনে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা ও শ্রমিক হিসেবে অন্তর্ভুক্তি সময়ের দাবি ।

সরকারের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো সহায়তা ছাড়াই নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে বেশ কয়েকটি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিকাশ সাধিত হচ্ছে । বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পৌঁছতে হলে এসব খাতকে দিতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি । উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রণোদনার পাশাপাশি অবশ্যই শ্রমিকদের সব রকম অধিকার এবং পেশাগত স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে সর্বাগ্রে ।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আরেকটি বড় সমস্যা হলো মৌসুমী বেকারত্ব । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব শ্রমিক চুক্তি ভিত্তিতে কাজ করে বিধায় কাজ থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করে তাদের মজুরি প্রাপ্তি । এসব শ্রমিকের জন্য সারা বছরের আয়ের নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা জরুরি ।

বাংলাদেশ সরকার প্রণীত জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২-তে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে - "দেশের মোট শ্রম-শক্তির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত । যার মধ্যে রয়েছে- কৃষি, নির্মাণ, গৃহকর্মী, গৃহ-ভিত্তিক শ্রমিক, চাতাল, ইটভাটা, গ্যারেজ, স্থল ও নৌবন্দর, পরিবহন খাত, আসবাবপত্র তৈরি, স'মিল, কাঠমিস্ত্রী, ঝালাই, অটোমোবাইল, দোকান, হোটেল-রেস্তোরাঁ, মৎস্য ও গবাদি খামার, পোল্ট্রি, প্যাকেজিং, কেমিক্যাল কারখানা, প্লাস্টিক কারখানা, ঔষধ শিল্প, স্বনিয়োজিত ইত্যাদি ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারী খাত । এই ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব । এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকার প্রয়োজনে একটি বিশেষ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে । "

জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-২০২০ (খসড়া) এর ৮.২ ধারায় বলা হয়েছে যে, "অসংগঠিত উৎপাদন খাতে (Unorgansied Manufacturing Sector) মান সম্পন্ন/ শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো (Enhancement) এবং সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় প্রকার উৎপাদন সেক্টরে কর্মীদের উপযুক্ত আয়/মজুরী, কর্মপরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।"

আশার কথা হচ্ছে যে, সরকার ইতোমধ্যে শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

আমরা সরকারের নিকট বিনীত অনুরোধ জানাই যে, সরকার যাতে হোমবেইজড শ্রমিক, ওয়েস্ট পিকার, হকার ও কৃষি শ্রমিকসহ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের অধিকার সূরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও তাঁদের যথাযথ কল্যাণের কথা ভেবে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান সংশোধন করে শ্রম আইনে তাঁদের "শ্রমিক" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

চলমান কোভিড-১৯ মহামারি সময়কালে, বাংলাদেশের অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বিপুল জনগোষ্ঠীর কাজ হারানো, আর্থিকভাবে নতুন করে অভাবগ্রস্ত হওয়া, পারিবারিক সহিংসতা ও দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি, পারিবারিক বিচ্ছেদ ও সামাজিক নিরাপত্তার ঘাটতির চিত্র সমাজের সকল স্তরকে বিশেষ ভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সকল শ্রমিকের নিয়োগপত্র, ন্যায্য মজুরি, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, স্বল্প ব্যয়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। তাঁদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, কর্মস্থলে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এখনই।

শ্রমবাজারে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক মানেই পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্রবিহীন শ্রমিক যাদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত নয়। কাজের নিশ্চয়তা, শোভন কাজ, ন্যূনতম মজুরি এবং অবসরকালীন সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়াই যাদের দিন কাটে নিতান্ত অনিশ্চয়তায়। দেশের ৬ কোটির অধিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিককে অনিশ্চয়তায় রেখে অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব। একদিকে বেকারত্ব অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রম প্রবাহ দুটোই দেশের অর্থনীতির ভঙ্গুর দশা প্রমাণ করে।

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নং ৮ অর্জনের নিমিত্তে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত সকল শ্রমজীবি জনগোষ্ঠীর আইনী অধিকার নিশ্চিতকরণ, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত সকল শ্রমিকদের শ্রম আইনের আইনের আওতায় নিয়ে আসা, কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অত্যাবশ্যক। এজন্য প্রয়োজন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সংক্রান্ত একটি টাইম বাউন্ড ন্যাশনাল এ্যাকশন প্ল্যান ।

মনে রাখতে হবে, অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের অধিকার, শোভন কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে অর্থনীতির চিত্র পাল্টে দেওয়া সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের যথাযথ এবং কার্যকর উদ্যোগ এবং এর আশু বাস্তবায়ন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মক্ষেত্রে যুবা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরসনের এখনই সময়

নইমুল আহসান জুয়েল
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা শ্রমিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসেব অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা অথবা পেশাগত রোগের কারণে সারা পৃথিবীতে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে ১ জন শ্রমিক মারা যায়। একই কারণে প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করে ৬,৩০০ জন এবং সারা বছরে মৃতের সংখ্যা ২৩ লক্ষ। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং পেশাগত রোগ প্রতিরোধ বা প্রতিকারের মাধ্যমে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অমানবিক মৃত্যুর সংখ্যা কমানো সম্ভব।

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই আমরা উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। বাস্তব বিবেচনাতেই আমাদের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও এখনো শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বিকল্প তৈরি হয়নি। যদিও স্বাধীনতার ৫০ বছরেও শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক কেবল মজুরিনির্ভর। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের ন্যায্য হিস্যা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিশ্চিত করা যায়নি শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা।

করোনা অতিমারীর এক বছর অতিক্রান্ত হলেও শ্রমজীবী মানুষ এখনো খুব একটা স্বাস্থ্য সচেতন বলে দৃশ্যমান নয়। অধিকাংশ শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন না। মালিকরাও কারখানায় স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না। তাছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনকারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করলেও মালিক-শ্রমিক এ বিষয়ে খুব একটা সচেতন নয়। ফলে একদিকে করোনা অতিমারীতে কারখানা বন্ধ হয়ে কাজের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে শ্রমজীবী মানুষ আরো দুঃস্থতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতাই পারে এই দ্বিমাত্রিক সংকট দূর করে একটি সুস্থধারার উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। ২০১৩ সালে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর করা হয়েছে "জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল। আইএলও কনভেনশন ১৫৫ (কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা) তাঁদের অনুসমর্থনকারী দেশগুলোর মধ্যে শ্রমিক ও মালিক সংগঠনগুলোর সাথে সমঝোতা করে জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমিয়ে আনা এবং বিদ্যমান কর্মপরিবেশ উন্নত করা। কিন্তু বাস্তবে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতে শ্রমিকদের সুরক্ষার উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়।

বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তি ৬ কোটি ২৫ লক্ষ, যার ৮৬.২% হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক। বাংলাদেশে মোট যুবা শ্রমশক্তি (১৫ বছর হতে ২৯ বছর) ২ কোটি ৫ লক্ষ, যার ১ কোটি ৩৭ লক্ষ পুরুষ এবং ৭১ লক্ষ হচ্ছে নারী শ্রমিক। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষা একটি স্পর্শকাতর ইস্যু হলেও প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা কোন কার্যকর উদ্যোগ দেখতে পাই না। অথচ ক্রমবিকাশমান এই শ্রমগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত একটি অস্বাস্থ্যকর এবং অরক্ষিত কর্মপরিবেশের মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এমনকি অনেক প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ও বিশুদ্ধ খাবার ব্যবস্থাও নেই। ফলে শ্রমিকদের বিভিন্ন অসুখবিসুখ দেখা যায় এবং উৎপাদন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবচেয়ে কর্মক্ষম এই বিশাল যুবা শ্রমিকদের টার্গেট করে আমাদের আগামি দিনের উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন-এর শ্লোগান ব্যর্থ হতে পারে।

শ্রম আইন -২০০৬ এ অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের কথা উল্লেখ থাকলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের সরবরাহের রীতি আমাদের দেশে খুব একটা নেই। অথচ বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে চাইলে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, আর এই উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ মনে করে চলমান উন্নয়নে এই প্রবাহ ধরে রাখতে হবে। সাথে সাথে উক্ত কর্মপ্রথা এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের অনুমোদনযোগ্য প্রয়াস বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এই উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত কর্মপরিকল্পনা। শ্রমিকদের শোভন কর্মক্ষেত্র এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকার, মালিক, শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠন সকলের দায়িত্ব। আমরা মনে করি বাংলাদেশকে আরো উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, আর শ্রমিককে অনিরাপদ এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রেখে কোনভাবেই উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে শ্রমবাজারে প্রতিবছর যে বিশাল যুবা শ্রমিকরা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন–এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্রে একটি সহনশীল ও নিরাপদ স্বাস্থ্য এবং নিরপত্তার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সরকার, মালিক, শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর উদ্যোগ গ্রহণের এখনই সময়।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দিবস ২০২১ সফল হোক।

Social Security programmes for the working population: A need for the changing times

Syed Moazzem Hussain
Senior Technical Advisor
Employment Injury Protection Scheme (EIPS) Project, GIZ

Background:

In February 2021, The Committee for Development Policy of the United Nations (UN CDP) put forward its recommendation for the graduation of Bangladesh from the Least Developed Country (LDC) status. Bangladesh will be given a transition period until 2026 to develop measures and infrastructures both physical and social to support the graduation.

While it is evident that the government is very much focused on developing the road infrastructure to support trade and growth but with regards to human capital development work has been ongoing since 2015. In 2015 the cabinet division approved the National Social Security Strategy (NSSS). The NSSS has focused on the consolidation of the social assistance programmes in Bangladesh. It was a foregone conclusion regarding the imminent middle-income status and the subsequent graduation from the LDC status for Bangladesh. Taking the inevitable into consideration, the NSSS had already prescribed schemes for the working population of Bangladesh. With the developments, there will be more Bangladeshis working in the formal sector than before and the rate of formalization will also pick up. With the existing and new formal workforce, the traditional protection measures will not be sufficient and adequate. The NSSS, therefore, suggested contributory schemes covering the areas of a workplace accident, maternity, unemployment, health and pension.

Figure 1 Social Protection Staircase as defined by the ILO

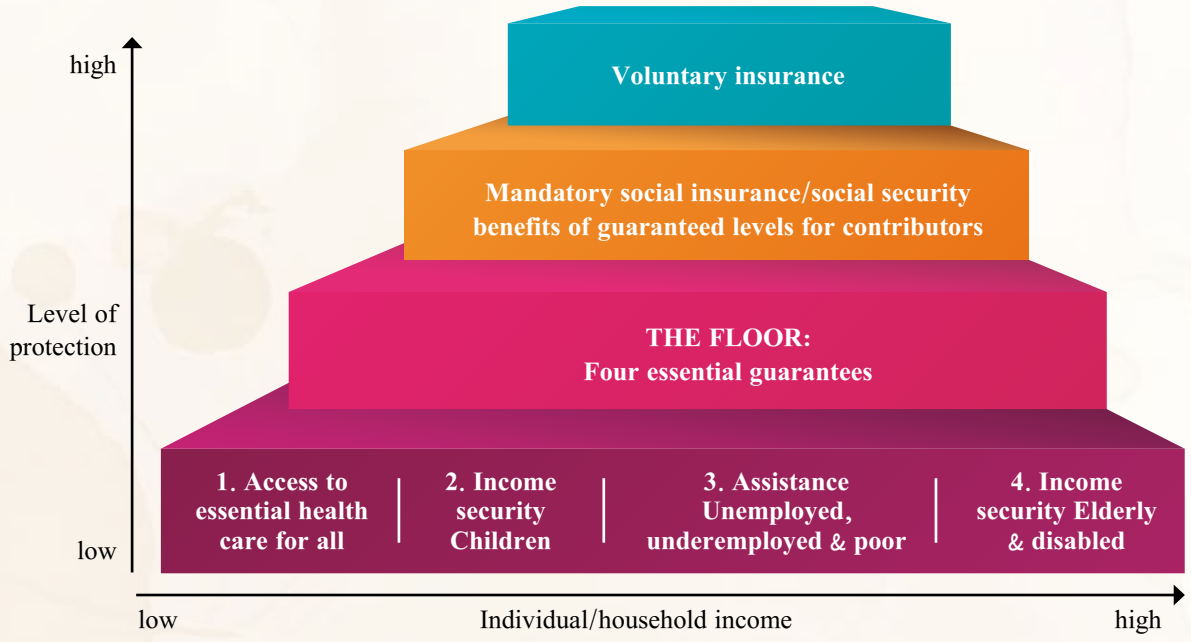

The strategy is in line with the ILO's social protection staircase. The model suggests that with the rising income countries should move towards mandatory social security schemes.

An Employment Injury Insurance (EII): The starting point of contributory schemes:

Social security is the protection that a society provides to individuals and households to ensure access to health care and to guarantee income security, particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss of a breadwinner. *(Facts on Social Security, ILO).* Social security programmes are typically financed through co-contributions from the employers and employees except for an Employment Injury Insurance scheme. These contributory schemes fall under the ambit of social insurance whereby the benefits are mandated by law and the contribution is based on the risk pooling approach. For any country to embark on introducing such schemes, an Employment Injury Insurance scheme is usually the starting point since the scheme is relatively cheap to finance.

Figure 2 Sequence of introducing contributory schemes

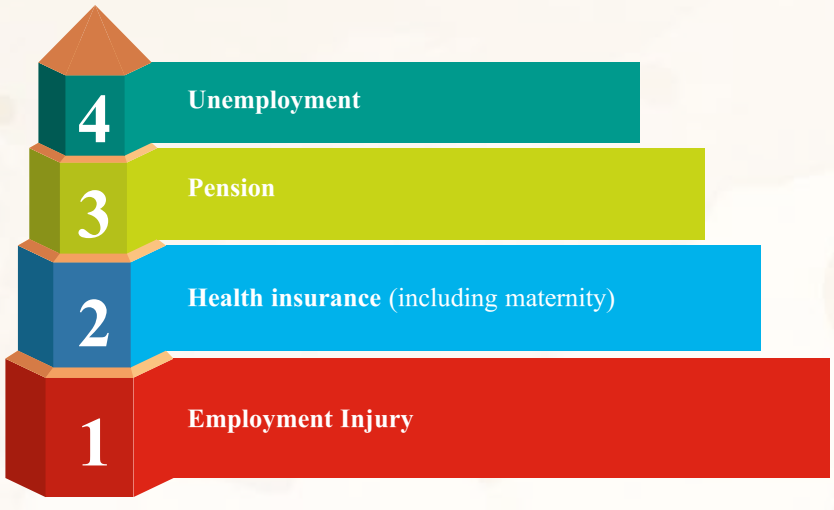

In case of Bangladesh, there are existing measures by which an employee when faced with workplace accident or occupational disease are entitled to certain benefits. All employees as defined by the Bangladesh Labour Act 2006 are entitled to lumpsum amounts in case of death and permanent disability. In case of prolonged time away from work due to injury and occupational diseases (temporary disability), there is a provision of financial compensation for up to two years. In both instances the amounts are to be paid by the employer. Further to this the owners have to subscribe group insurance as well as pay into either the Bangladesh Labour Welfare Foundation fund or the Central Fund (depend on business type).

The employer is also mandated to pay/arrange for medical treatment due to injury and occupational diseases. The medical treatment is to be provided until the employee has recovered.

The limitation of the current system is the fragmentation of the financing i.e. the employer having to pay at three different avenues for the same issue and the notable exclusion of rehabilitation measures for injured workers. Further to this, the employer's financial burden remains unchecked in case of a large-scale accident and also in individual cases, the payments to employees or their dependents depend on the financial health of the establishment. For the employees, the lumpsum nature of the payments does not actually compensate for the loss.

Average contribution rate is less than 1 percent the worker's salary, and EII is the only logical evolution of the current system. An EII ensures that compensation due to workplace injuries and occupational diseases are paid using a globally accepted standard, ILO convention 121, but also ensures that appropriate rehabilitation measures are in place. An EII closes the loop by considering prevention activities.

In terms of affordability of the scheme, it has been stressed that the employers are already paying into various pockets therefore consolidation of these payments into one single basket will allow for smooth financing of the schemes. This approach eradicates the limitations of the current schemes and promotes equity and solidarity.

In terms of regional practices with regards to the implementation of an EII, Bangladesh is one of the few countries which does not have any form of social security let alone an EII.

Figure 3 Country comparison -social security penetration. Source: ILO

Country	Health Care	Sickness	Unemploy-ment	Old Age	Employment Injury	Family	Invalidity	Survivors
Bangladesh								
Cambodia	Depen-dents not covered							
Ethiopia		Employer liability						
India								
Indonesia								
Myanmar			Not imple-mented					
Pakistan								

From the above figure, it is quite evident that- all countries irrespective of the financial state has the means of establishing a social security system. As illustrated in figure 2, an EII is usually the starting point for a social security reform.

The curious case of COVID 19 and the resilience of the existing system:

The COVID 19 pandemic has made the situation more vulnerable. Even the mature states have faced difficulty in containing the effects of the pandemic. Bangladesh's approach has been to inject funds into the economy in the form of stimulus packages and provide food assistance to the vulnerable. On the issues that the economy faced by that of lay offs and termination of employment contracts. Overnight many employees were left without jobs. Employers were given soft loans for the provision of wages to their employees. With no existing schemes covering the employers with social security benefits, the government faced hurdles in gathering and verifying data for the intended beneficiaries. Further to this, fresh funds had to be allocated for the payments.

A social security scheme helps government systems to be shock responsive. Shock responsive refers to systems that can handle risks posed to a large number of households at once. In times of such risks, existing schemes have usually five options to tackle with them:

Figure 4 Typology of options for shock responsive adaptation. Source OPML

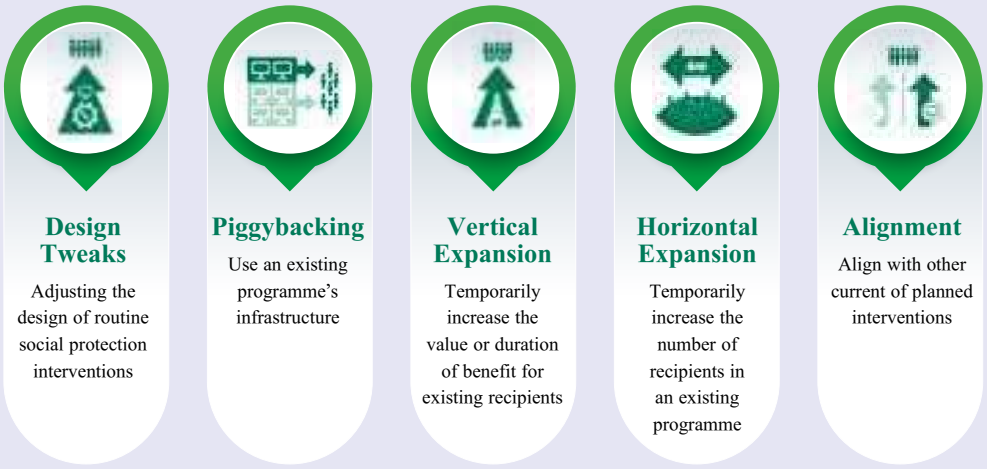

An existing scheme would have allowed for 'Piggybacking' to provide unemployment benefits to the employees who have lost their jobs.

The trial on Employment Injury Scheme (EIS):

Considering the certain constraints, Bangladesh may start its EII development with a trial of the scheme. Under the trial, the Ready-Made Garment sector may be covered and workers from the sectors may also receive a financial benefit as per the international standard for death and permanent disability due to workplace injuries and occupational diseases. As a seed funding, international brands, who are sourcing from Bangladesh, can contribute during the trial period and after the end of the trial, the costs will be borne by employers.

Data or the lack of it- Challenges going forward:

In the case of employment injury insurance, data related to the enterprises, the employees, accidents and occupational diseases are, in some cases, hard to come by or lacking altogether.

On the side of health and safety, which is the foundation of an EII, except certain industrial sectors, there is a lack of safety culture. Formalization of employment and mainstreaming of safety culture should go hand in hand.

On the rehabilitation front, it should be noted that the country overall lacks the infrastructure for an all-inclusive society. Even if the on-going labour act mandates the employers to provide rehabilitation services, there is still a general lack of support services in the country that will create an enabling environment for the employers to fulfill their mandate.

With regards to national capacities in administering such schemes, there is a wide area of improvement. Capacities need to be developed both in the government as well as in the private sector. Skills such as actuarial calculation, investment of social security funds, information technology and others need to be enhanced to set the foundation for the future.

Conclusion:

Bangladesh now at crossroads between a developing nation and a developed one. For the country to move forward on to the later, social security schemes, along with the ongoing social assistance programmes, need to be developed. An EII poses to be the most viable option for the country to start the reform. With the looming trial on EIS, there is sufficient headwind to implement a nationwide EII scheme that not only benefits the employees but also the employers. Along with this, the country must look at addressing the challenges related to data, capacities, OSH culture and rehabilitation to fulfill its ambition.

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা (২৮.০১.২১)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে কেক কাটেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (১৭.০৩.২১)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি কর্তৃক সিল্ক, ট্যানারি, সিরামিক, গ্লাস, জাহাজ রিসাইক্লিং এবং রপ্তানীমুখী চামড়াজাত দ্রব্য ও পাদুকা সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করা হয় (৪.০২.২১)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’ উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারকারী আনিশা আনজুম আবৃত্তির হাতে সনদপত্র ও প্রাইজবন্ড তুলে দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (১৭.০৩.২১)

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল। (১৫.৮.২০)

ডাইফ উপমহাপরিদর্শকদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে "ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্ট অব নেগোসিয়েশন" বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম। (২৪.০১.২০২১)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম-এর নিকট থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন ডাইফ যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান (২৭.৭.২০)

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় শিল্প কলকারখানার শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (২১.০৩.২০)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল (১৭.০৩.২১)

নবনিযুক্ত মহাপরিদর্শক জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করছেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তাগণ (৩০.০৩.২১)

‘কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা’-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান (০৮.১০.২০)

“DIFE Reform Roadmap Review Workshop”-শীর্ষক কর্মশালায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। (৩০.০৯.২০)

মহাপরিদর্শক জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের স্টাফ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। (২৩.০৩.২১)

মহাপরিদর্শক জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। (২৯.০৩.২১)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইনহাউজ প্রশিক্ষণের একটি সেশন পরিচালনা করেন মহাপরিদর্শক জনাব মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ। (৩১.০৩.২১)

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক TOT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণ শেষে ডাইফের মহাপরিদর্শক (প্রাক্তন) জনাব শিবনাথ রায় এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ (৩.০৯,২০)

ডাইফ প্রধান কার্যালয়ে গাজীপুরস্থ ঝরণা ফ্যাশন-এর মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে শ্রম অসন্তোষ নিরসন বিষয়ক সভা (০৩.০৩.২০)

উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' পরিদর্শন করেন (১৩.০১.২০)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকদের জন্য আয়োজিত 'অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেনশন'-শীর্ষক প্রশিক্ষণের একটি সেশন পরিচালনা করেন ডেনিশ অ্যাম্বাসির পদস্থ কর্মকর্তা মি. সরেন আলবার্টসেন। (৩১.০৭.১৯)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নরসিংদি কর্তৃক প্রাণ ডেইরি কারখানা পরিদর্শন। (২৩.১২.২০)

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, দিনাজপুর, কর্তৃক কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে মেসার্স সুপ্রিয় জুট মিলে বিশেষ পরিদর্শন। (১২.০৪.২০২১)

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০

International Labour Organization
Canada
Kingdom of the Netherlands
UKaid from the British people
Vision Zero Fund